ব্রাত্য

নারায়ণ সান্যাল

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী ১৯৬১

পৌষ ১৩৬৮

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং হাউস

২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রাকর

শ্রীমদনমোহন চৌধুরী

শ্রীদামোদর প্রেস

৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট

গৌতম রায়

শ্রীকালিদাস সান্যাল

ও

শ্রীমতী কল্পনা দেবীকে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্মৃতিস্বরূপ

প্রবীণ ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরীর হঠাৎ মনে হল দীর্ঘ জীবনটা তাঁর বুঝিবা ব্যর্থই হয়ে গেছে। খোলা খবরের কাগজটা পড়ে আছে অপঠিত, আধখাওয়া কফির কাপের কোনায় মাছির জটলা। সিগারের আগুনটা যে বহুক্ষণ হল নিবে গেছে দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর বুঝি তা জানতে পারে নি এখনও। উদাস দৃষ্টি মেলে পরমানন্দ তাকিয়ে ছিলেন জানালার বাইরে। সকালের রৌদ্র বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। নন্দ-বেয়ারা এসে কফির কাপটা তুলে নিয়ে গেল। একবার ইতস্তত করে খাবারের প্লেটটার সামনে দাঁড়িয়ে, তারপর কি মনে করে সেটাও তুলে নেয় হাতে।

হঠাৎ কি ভেবে ওকে ফিরে ডাকলেন চৌধুরীসাহেব। নন্দ নিশ্চয়ই আশা করে নি, থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাতেই বোঝা যায়। …নন্দ হেসে বলেন, ওটা নিয়ে যাচ্ছিস কেন রে? খাই নি আমি।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নন্দ জবাবে বলে—একেবারে জুড়িয়ে গেছে …, আমি আবার গরম করিয়ে আনছি।

ঐ টোস্ট আর পোচটা শুধু নিয়ে যা। ফ্রুট্স্-এর প্লেটটা রেখে যা বরং। আর পারিস তো কফি আর একবার করে পাঠিয়ে দিস।

কৃতার্থ হয়ে গেল নন্দ। খাবারের প্লেটটা আবার টিপয়ে নামিয়ে রেখে চলে যায় সে।

কয়েকটা আপেলের টুকরো তুলে মুখে দিলেন। ইচ্ছা করছে না—তবু খেতে হবে। প্লেটটাকে শেষ করতে হবে। না হলে ওরা মনে করবে সাহেব একেবারে ভেঙে পড়েছেন—অন্নজল ত্যাগ করেছেন বুঝিবা। খেতে কিন্তু বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করছে না—জানালা দিয়ে …গুলো বাইরে ফেলে দিয়ে প্লেটটা খালি করে রেখে দিতে ইচ্ছা

করছে। কিন্তু তা করার উপায় নেই। ধরণীর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। ঠিক ধরে ফেলবে চালাকিটা। এখনই বাগান সাফ করতে এসে লক্ষ্য হবে তার। মন দিয়ে খেতেই শুরু করেন শেষ পর্যন্ত।

তারপর হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়ায় আবার থেমে যান।

সত্য কথাই কি বলে নি নীলা? এই তো একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে তিনি কি করছেন? ক্ষুধা নেই বিন্দুমাত্র—তবু খাচ্ছেন। কেন? কারণ তিনি গোপন করতে চান তাঁর মানসিক বিপর্যয়ের সংবাদটা। তিনি পছন্দ করছেন না—কেউ বুঝতে পারুক যে নীলার অবর্তমানে পরমানন্দের কর্মময় জীবনে বিন্দুমাত্র ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। না হয় নি! হতে পারে না! যে মেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে বাপকে ত্যাগ করে চলে যায় তার জন্য কোনও দুঃখ নেই পরমানন্দের, কোনও ক্ষোভ নেই। নীলার অনুপস্থিতিতে একচুল বিচ্যুত হবে না তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের গতি। তাই প্রাতরাশের টেবিলেই তিনি রেখে দিতে চান সেই সিদ্ধান্তের প্রথম স্বাক্ষর।

তা যেন বুঝলাম। তবু একটা কিন্তু রয়ে গেল যে। মেনে নিলাম তোমার যুক্তি,—কিন্তু তা সত্ত্বেও ও যুক্তির মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গেল না কি?

গত পনেরো-বিশ বছর ধরে তিনি এমন নিঃসঙ্গভাবে প্রাতরাশ সমাধা করেন নি। টিপয়ের উপরে কফির পট আর দুটি কাপ নামিয়ে রেখে চলে যেত নন্দ। শ্রীমন্ত ঠাকুরের হেঁসেল থেকে নিয়ে আসত টোস্ট আর পোচ। তিনি ইজিচেয়ারটায় এলিয়ে বসতেন। বেতের হেলান-দেওয়া চেয়ারটায় এসে বসত নীলা। কফির ডিক্যানটার থেকে কফি ঢেলে দুধ মেশাত, নিজের কাপে ফেলত টুকটুক করে সুগার-কেক আর তাঁর কাপে স্যাকারিন। এর পর টোস্টে মাখন লাগাতে শুরু করলেই পরমানন্দ উৎকর্ণ হয়ে উঠতেন একটা ছোট্ট ধমকের জন্যে, কাগজটা এখন রাখ দিকিনি, খেয়ে নিয়ে যত ইচ্ছে প'ড়ো কোন মীঠিতে কোন মহাপ্রভু কি দেশাত্মবোধের বাণী ঝেড়েছেন। এখনই হয়তো ননীকাকা এসে টেনে নিয়ে যাবেন—আর খাওয়া হবে না তোমার।

অগত্যা চশমাটা খুলতে হয় তাঁকে। নামিয়ে রাখতে হয় খবরের কাগজটা।

আজকের প্রাতরাশটা এ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি নয়। এ একটা ব্যতিক্রম। শুধু ও-ধারের বেতের চেয়ারটা শূন্য আছে বলেই নয়—বৈসাদৃশ্যটা আরও ব্যাপক। আজকে কফির পট আসে নি, আসে নি মিল্ক-পট, সুগার-পট। এসেছে তৈরী কফি। এটা শ্রীমন্ত ঠাকুরের কেরামতি নয়—নন্দ-বেয়ারার দূরদৃষ্টির পরিচয়। সে বুঝেছে তৈরী কফি পাঠানোই আজ যুক্তিযুক্ত। তাই আজ টোস্টের উপরেও আগে থেকেই লাগানো আছে মোলায়েম মাখনের আস্তরণ। যেন এই প্রসঙ্গে কোনক্রমেই না মনে পড়ে যায়—দিদিমণির কথা। কাল রাত্রি থেকে এ বাড়িতে যে একটি লোক কমে গেছে এ সত্যটা ওরা প্রাণপণ চেষ্টায় গোপন রাখতে চায়।

কিন্তু যে কথা ভাবছিলেন। খেতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে না—তবু খাচ্ছেন। ক্ষুধা না থাকার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ সময় এ খাদ্য তাঁর নিয়মিত তালিকাভুক্ত। তবে এ অরুচি কেন ? নিঃসংশয়ে নীলার অনুপস্থিতিই এর কারণ। সত্যটা অনস্বীকার্য, অন্তত নিজের কাছে। তা হলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যে তিনি খাচ্ছেন সেটা তো শুধু লোক দেখানো। অর্থাৎ প্রতিটি গ্রাসের বক্তব্য—'তোমরা দেখো, আমি খাচ্ছি-দাচ্ছি, দিব্যি আছি। তোমাদের দিদিমণি থাক না থাক, আমার ভারি বয়েই গেল!' কথাটা মিথ্যা—তবু এ মিথ্যা আবরণের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন শুধু লোক দেখানোর জন্য। আর তাও কে সে লোক ? না, ঐ শ্রীমন্ত ঠাকুর, নন্দ-বেয়ারা, আর ধরণী মালী! এদের চোখে একটা মিথ্যাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসেই কি তিনি খাচ্ছেন না আপেলের টুকরোগুলো ?

'এ যদি তুমি আদর্শের জন্যে করতে বাবা, তা হলে আমি মেনে নিতাম···কিন্তু তা তো নয় ··তুমি শুধু সুনামের মোহে, শুধু প্রতিপত্তির লোভে, শুধু পদমর্যাদার মুগ্ধ মোহাবেশে ছুটে চলেছ এ পথে···কি করা উচিত তা আর তুমি ভাব না···কি করলে ওরা তোমার যশোগান করবে

সেই চিন্তাতেই তুমি বিভোর।···তোমার অস্তিত্ব পর্যন্ত তুমি বিকিয়ে দিয়েছ ওদের ভালো-লাগা-না-লাগার বিচারে।',

খাবারের প্লেটটা সরিয়ে রাখলেন পরমানন্দ।

নীলা অন্যায় করেছে। নীলার গৃহত্যাগে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, হতে পারেন না, হওয়া উচিত নয়। তবু এই অক্ষুধা, এই যে খাওয়ার অনিচ্ছা, এটা নিঃসংশয়ে নীলার অনুপস্থিতিজনিত। মিথ্যা দিয়ে কখনও কাউকে তিনি ভোলান নি। আজও ভোলাবেন না। নিজের মনকে আগে জয় করতে হবে। তারপর সেই কুলিশকঠোর মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে দেবেন আর পাঁচজনকে।

নন্দ এসে কফির কাপটা নামিয়ে রাখে টেবিল। সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ ত্যাগ করে পরমানন্দ তাকে বলেন—থাক, নিয়ে যা। ভালো লাগছে-না এ-সব।

নন্দ বোধ হয় চমকে ওঠে। ঠিক লক্ষ্য করেন নি উনি। নন্দর দিকে আর তাকিয়ে দেখা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। তবু অনুভব করেন অভুক্ত খাবারের প্লেট আর কফির কাপটা নিয়ে সে চলে যায়। যাবার সময় সে কি তাকিয়েছিল তার মনিবের দিকে! কি ছিল সে দৃষ্টিতে?

জীবনের চল্লিশটা বছর আজ এসে দাঁড়িয়েছে ভিড় করে ওঁর চোখের সামনে। কি তিনি সত্যি চেয়েছিলেন জীবনে? কি পেয়েছেন, কি পান নি, আর কি পেয়ে হারিয়েছেন? এত দিন তো সব আঘাত, সব ক্ষয়ক্ষতি নির্বিচারে বুক পেতে গ্রহণ করেছেন। কোনও দুর্ঘটনাতেই তো এমন শূন্য মনে হয় নি জীবন। আর কি সব দুর্ঘটনা! সে-সবের তুলনায় নীলার এই সিনেমাসুলভ সংলাপ, এই নাটকীয় তিরোভাব তো হাস্যকর। নাটকে আর নভেলেই এ-সব ঘটে এতদিন এটাই ভেবেছিলেন। আজ তাঁর জীবনেই ঘটল এটা। অবাধ্য মেয়েটা বলে কিনা---তিনি চ্যুত হয়েছেন তাঁর আদর্শ থেকে। ঔদ্ধত্যেরও একটা সীমা থাকা উচিত! নিজে থেকে চলে না গেলে হয়তো তাড়িয়েই দিতেন ওকে!

কিন্তু!

' যৌবনে আর প্রৌঢ়ত্বে নিয়তির নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন তিনি বারেবারে। তাহলে আজ এত সামান্য আঘাতে এতটা বিচলিত বোধ করছেন কেন? অন্তরে কি সত্যই দুর্বলতা এসেছে? ডাঃ পরমানন্দ চৌধুরীর অন্তরে দুর্বলতা! মনে মনেই হাসলেন তিনি। পূর্বপক্ষ আর উত্তরপক্ষ হঠাৎ চুপ করে গেল ওঁর মনের মধ্যে, থামাল তাদের ঝগড়া।

দশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে।

শহরের সবচেয়ে নামকরা সার্জেন ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরীর বাড়িটা জনপদের পশ্চিম প্রান্তে। কলকোলাহলমুখর প্রাণচঞ্চল শহরের মাঝখানে তিনি বাড়িটা করেন নি ইচ্ছা করেই। তবু ভিড় জমে থাকে সামনের লনে সকাল থেকে। গাড়িতে, রিকশায়, সাইকেলে আসে রুগীরা অথবা তাদের আত্মীয়েরা। দোতলা বাড়ি—সামনে প্রকাণ্ড লন। কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। মরশুমী ফুলই বেশী। একসার টবে নানা জাতের ক্যাকটাস। আছে একটা জবা, আর একটা কাঞ্চনও। সামনের লাল কাঁকরের পথটা এসে পোর্টিকোর নিচে আশ্রয় খোঁজে। ফটকের উপর মর্নিং গ্লোরি লতাটা নীলাম্বরী পরে প্রথমেই স্বাগত জানায়। গেটের ধারেই, অর্থাৎ প্রায় রাস্তার উপরেই, একসার ঘর। রুগী দেখার ঘর, ডিস্‌পেন্সিং রুম, অপারেশন থিয়েটার, আর ছোট ছোট কেবিন। এ ছাড়াও আছে একটা ল্যাবরেটরি। রক্ত পরীক্ষা, মলমূত্রাদি পরীক্ষা তো বটেই, এমন কি এক্স-রে নেবার ব্যবস্থা পর্যন্ত আছে। ছোটখাটভাবেই শুরু করেছিলেন আমেরিকা থেকে সার্জেন হয়ে ফিরে আসার পর। চেয়েছিলেন শহরের একান্তে নিরিবিলিতে বিকিয়ে দেবেন জীবনটা। ছোট্ট সংসারের বেড়া-দেওয়া পরিধিতে সীমিত করতে চেয়েছিলেন নিজেকে। বাইরের সমস্ত আঘাত থেকে আত্মগোপন করবার একটা শম্বুকবৃত্তি তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল এই অন্তেবাসীর জীবনের দিকে। শুধু শহর কেন—দেশের সঙ্গেই বিশেষ সম্পর্ক রাখেন নি। বাড়িখানাও বানিয়েছিলেন ওদেশী ছাঁদে। না হলে

রি-ইনফোর্সড কংক্রীটের এই যুগে কেউ কখনও বানায় অমন ঢালু ছাদের বাঙলো বাড়ি ? ছায়া-থমথম নির্জনতায় শহরতলীর এই বাড়িটা যেন আর পাঁচখানা স্বগোত্রের সঙ্গে তফাত রচনা করতেই গায়ে জড়িয়েছে লাল ইঁটের পয়েন্টিং-করা কুর্তা ; ওল্ড-ইংলিশ স্থপতিপর্যায়ের খিলানে খিলানে যেন ভুরু কুঁচকেই আছে ;—স্কাইলাইট আর চিমনিতে যেন সে ভৌগোলিক বন্ধনটাকেও অস্বীকার করতে চায়। পথ-চলতি মানুষের স্বতই মনে হয়, এ-বুঝি কোনও ইংরাজ দম্পতির আবাসস্থল—কোনও রিটায়ার্ড সিভিলিয়ানের ডেরা। কথাটা আধা সত্য। ইংরাজ না হলেও আমেরিকান। দম্পতি না হলেও তার আধখানা। পরমানন্দ যেদিন গেটওয়ে-অফ-ইণ্ডিয়ার তলা দিয়ে ফিরে এসেছিলেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সেদিন তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন দুটি বিদেশী মহিলা। মিস অ্যারিঅ্যাডনি ও'নীল এবং তাঁর গড-মাদার মিস গ্রেহাম। মিস ও'নীল অবশ্য তাঁর প্রাগ্‌ বিবাহ পর্যায়ের সংজ্ঞা, এদেশের মাটিতে পা দেবার পূর্বেই তাঁর নামান্তর হয়েছিল—মিসেস অ্যারিঅ্যাডনি চৌধুরী। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে বিবাহ করেছিলেন পরমানন্দ। ঠিক ছাত্রাবস্থায় নয়—তখন তিনি যুক্ত ছিলেন শিক্ষানবিশ হিসাবে একটা হাসপাতালের সঙ্গে—যে হাসপাতালে নার্স হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন তাঁর ভাবী জীবনসঙ্গিনীর গড-মাদার মিস গ্রেহাম। নার্স গ্রেহামই ছিলেন সে দ্বন্দ্ব-সমাসের হাইফেন। তাঁরই মাধ্যমে চৌধুরীর হয়েছিল ও'নীলের সঙ্গে পরিচয়, প্রণয় ও পরিণামে পরিণয়।

ও'নীলের পূর্বপুরুষেরা আমেরিকায় এসেছিলেন আয়ার্লণ্ড থেকে। ওর মা ওকে মৃত্যুশয্যায় দিয়ে যান মিস গ্রেহামের হাতে। তখন কতই বা বয়স ওর ? মিস গ্রেহাম ওকে মানুষ করেছিলেন—নিজের মেয়ের মতোই। ব্রোঞ্জের ক্রুশচিহ্নটার মতোই তাঁকে সর্বদা বুকে বয়ে বেড়াতেন। ওর বাপ ছিলেন নাবিক—সমুদ্রযাত্রা থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি। পরমানন্দের হাতে তাকে সমর্পণ করে পরম আনন্দ না পেলেও পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন গ্রেহাম। মেয়ে-জামাইকে বিদায় জানাবার সময় জামাই জিদ ধরে বসল মিস গ্রেহামকেও সঙ্গে

যেতে হবে। শুনে হেসেই বাঁচেন না গ্রেহাম। বলেন—এতদিন আমেরিকায় থেকেও তুমি খাঁটি ভারতীয় রয়ে গেলে চৌধুরী! না হলে শাশুড়ীকে কেউ হনিমুনে সঙ্গী হতে বলে?

চৌধুরী কিন্তু সে যুক্তি শোনেন নি। মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসার পর এই প্রৌঢ়া আজীবন কুমারীর নিঃসঙ্গ জীবনের গ্লানিকর অবসাদটা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তাই একরকম জোর করেই নিয়ে এসে-ছিলেন তাঁকে এদেশে।

বাবা মা তুজনেই তখন গত হয়েছেন। পরমানন্দের পিতা অঘোরানন্দ ধর্মত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। সুতরাং গ্রামের বাস তাঁদের উঠেছিল একপুরুষ আগেই। ভারতবর্ষে এসে কোনও বড় শহরে বসতে পারতেন ডাক্তার চৌধুরী, কিন্তু কি জানি কেন, এই মফঃস্বল শহরটাকেই বেছে নিলেন উনি। শহরের সামাজিক জীবন থেকে একান্তে সরে থাকতে চান বলে জনপদপ্রান্তে বানালেন এই বাঙলোটা। এ বাড়ির ভিতের গাঁথনিতে রয়ে গেছে মিস গ্রেহামের স্বাক্ষর। আমেরিকান ডলারই ভারতীয় মুদ্রাব বকযন্ত্রে চোলাই হয়ে রূপায়িত হল ইট-কাঠ-চুন-সুরকিতে। অবশ্য পরবর্তী যোজনা যা কিছু —তা পরমানন্দের উপার্জনে।

এত অল্প সময়ে এতটা পশার হবে এ যেন কল্পনাই করা যায় নি। অবশ্য ওঁর উন্নতির মুখে ছিল বার্টন অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানির কারখানাটা। শহরের এ প্রান্তে হু হু করে বেড়ে উঠল কারখানাটা। এল নানাদেশী লোক—ভারতীয় কর্মী আর বিদেশী অফিসার। সাহেবী কেতার মানুষ চৌধুরী ডাক্তারের সঙ্গে সাহেব মহলের অন্তরঙ্গতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারখানার কোয়ার্টার্স ছেড়ে মেমসাহেবদের একমাত্র বেড়াতে আসার স্থল ছিল এই বাঙলোটা। চৌধুরী গোটা কারখানাটার পারিবারিক চিকিৎসক হয়ে পড়লেন ক্রমে। আউট-হাউসটা ভেঙে বড় করে অপারেশন থিয়েটার বানাতে হল। তৈরী করতে হল নার্সিং হোমের কেবিনগুলো। ওর হাসপাতালটা যেন কারখানার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গায়ে গায়ে বেড়ে উঠল · বড় হয়ে উঠল।

আজ এই নার্সিং হোমের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ডাক্তার চৌধুরীর—মালিক তো ননই। নার্সিং হোম তার নিকটতম প্রতিবেশী—তার প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক আজ চুকিয়ে দিয়েছে। ওটা ফ্যাকটরির সম্পত্তি—অবশ্য কারখানার অন্যতম ডিরেকটর আজ ডাক্তার পরমানন্দ।

আজ থেকে দশ বছর আগে কিন্তু সম্বন্ধটা ছিল অন্য রকম। তখন একনিষ্ঠকর্মী ডাক্তারটি ছিলেন এই সেবাসদনের প্রাণস্বরূপ। গুটি তিনেক জুনিয়ার ডাক্তার সহযোগী ছিলেন তাঁর। পরমানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এর চিকিৎসা বিভাগে। মিস গ্রেহাম ছিলেন নার্সিং-ব্যবস্থার কর্ণধার—আর সমস্ত কিছুর হিসাবনিকাশ থেকে শুরু করে এর সামগ্রিক পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল মিসেস চৌধুরীর নখদর্পণে। উদয়াস্ত ওরা তিনজনে মেতে থাকতেন সেবাসদনের সেবায়। সকাল-সন্ধ্যায় মিসেস চৌধুরী এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন আর্ত রোগীদের। কখনও ওদের শিয়রে বসে গল্প করতেন, কখনও সান্ত্বনা দিতেন, কখনও নিয়ে আসতেন ফুল-ফল।

না, ভুল হল পরমানন্দের। দশ বছর আগেকার যে দিনগুলির কথা আজ তাঁর মনে পড়ছে তখন মিসেস চৌধুরীর যাতায়াত ছিল না হাসপাতালে। তার বহু পূর্বেই তিনি বিদায় নিয়েছেন এই দুনিয়া থেকে। মিসেস চৌধুরীর মৃত্যু হয়—মনে আছে ডাক্তার চৌধুরীর—যে বৎসর সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিলভার জুবিলি হয়, সেই বছর। ঐ উৎসবে চৌধুরী সাহেব কয়েক হাজার টাকা খরচ করেছিলেন নার্সিং হোমের আলোকসজ্জা আর আতশবাজির আয়োজনে।

মিসেস চৌধুরী সুতরাং সেদিন ছিলেন না এ সংসারে। ছিল অসীম আর নীলা। অসীম তখন বোধহয় থার্ড ইয়ারের ছাত্র; আর নীলা মনে হচ্ছে সে বৎসরই ম্যাট্রিক দেবার আয়োজনে ব্যস্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের অপেক্ষায় উইংস-এর পাশে প্রহর গুণছে। উনিশ শ বেয়াল্লিশের আগস্ট মাসের শেষাশেষি, না কি সেপ্টেম্বর প্রথম সপ্তাহ? জাপানী আক্রমণের

উৎকণ্ঠায় সারা দেশ তখন কণ্টকিততনু। মিত্রশক্তি সংহত করতে চাইল ভারতবর্ষের জনশক্তিকে। সংঘাত বাধল ভারত সরকারের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের। বোম্বাইয়ের জনসভায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সমবেত হলেন। কর্মসূচী ঘোষণা করার পূর্বেই সরকার চেপে ধরল জননায়কদের কণ্ঠনালী। রাতারাতি কারারুদ্ধ হলেন সবাই। মহাত্মা, জওহরলাল, আজাদ, সরোজিনী। সমস্ত ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ গণআত্মা নিরুদ্ধ আক্রোশ চাপতে না পেরে ফেটে পড়ল একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আকারে। জাতীয় কংগ্রেসের কি নির্দেশ ছিল, তা আর জানা গেল না। গুজব রটল মুখে মুখে। লুণ্ঠিত হল রাজকোষ, অধিকৃত হল থানা, আর ডাকঘর। টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মূর্ছিত হয়ে। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একদল বলে—এ কখনও মহাত্মার নির্দেশিত পথ নয়। এ হিংসার রক্তস্রাবী পথ কখনও আন্তরিক অনুমোদন পেতে পারে না তাঁর। আর একদল বললে—এই হচ্ছে বিক্ষুব্ধ অপমানিত ভারতবর্ষের গণআত্মার আদেশনামা—এবং যেহেতু মহাত্মাই এই জনগণমনের অধিনায়ক তাই তাঁরও অনুমোদন আছে এ গণবিক্ষোভে।

পরমানন্দের অন্তঃপুরেও এসে লাগল এই বিতর্কের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। শান্ত রাজভক্ত পরিবারটির মধ্যে দেখা দিল দুটি বিভিন্ন শিবির। স্কুলের দশম বার্ষিক শ্রেণীর দোলায়িতবেণী কিশোরী নীলার ধ্রুব বিশ্বাস—এ বিপ্লব জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। অসীম তা অস্বীকার করে। নীলা সর্বান্তঃকরণে বর্জন করতে চায় ভারত সরকারকে—মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে। অপরপক্ষে অসীম উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে। জাতীয়-রক্ষী-বাহিনী না কি যেন একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে যুক্ত। শাসন-শৃঙ্খলা যাতে ভেঙে না পড়ে, জাপানী আক্রমণের এই সংকটমুহূর্তে যাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অক্ষত রাখা যায়, তাই স্থানীয় এস. ডি. ও. সাহেব আয়াঙ্গার শহরের রাজভক্ত প্রজাদের নিয়ে গড়ে তুললেন একটা আধা-সরকারী

প্রতিষ্ঠান। অসীম তারই একজন মেজ না সেজ ধরনের অফিসার। খাকি পোশাক পরে, মাথায় হেলমেট চাপিয়ে সেই কোন ভোরে উঠে চলে যায় প্যারেড গ্রাউণ্ডে। দল বেঁধে কখনও বের হয় আবার রাজপথে। হাতে ঝাণ্ডা আর ফেস্টুন : আমাদের হাতে অস্ত্র দাও।

—আমাদের হাতে অস্ত্র দাও! মনে মনে হাসতেন পরমানন্দ।

ভাইবোনে কেবলই তর্ক চলে সারাদিন। ওরা কখনও কখনও সালিশ মানে বাবাকে। পরমানন্দ জবাব দেন না। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করেন প্রাতরাশের টেবিলে। মিস গ্রেহামও এ প্রসঙ্গে একেবারে নীরব থাকতেন।

ক্রমশঃ পরমানন্দ লক্ষ্য করলেন, ব্যাপারটা নিছক কৌতুকের সীমারেখা অতিক্রম করতে চলেছে। বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পরিস্থিতিটা। জীবনে কোনদিন কখনও তিনি ছেলেমেয়েদের উপর নিজের মতামত আরোপ করেন নি; তাই মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন শুধু। মুখে কিছুই বলতেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ঘটনাগুলি কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না। আর এ ঘটনাগুলো যে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে—এটাও অনুমান করতে পারেন উনি।

নীলা আর অসীম দুজনে দুজনকে এড়িয়ে চলে। পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েটিকে হঠাৎ একদিন দেখা গেল খদ্দরমণ্ডিত বেশে। ব্যাপারটা একেবারে অচিন্ত্যনীয়। বিলাতী কেতার মানুষ রাজভক্ত পরমানন্দ চৌধুরীর অন্তঃপুরে খদ্দর! এ যেন পরম বৈষ্ণবাচার্যের আখড়ায় পাঁঠার মুড়িঘণ্ট! সকাল বেলা প্রাতরাশের টেবিলে সে যখন এসে বসল সবুজ রঙের খদ্দরের শাড়ি পরে, তখন চমকে উঠেছিলেন উনি। চোখ তুলে একবার দেখেই মনোনিবেশ করলেন কাঁটা-চামচে।

ড্রইং আর ডাইনিং রুম দুটো পাশাপাশি। মাঝখানে একটা বড় আর্চওয়ালা ফোকর। দরজা নেই। মোটা পেতলের রড থেকে ঝুলছে একটা ভারী নেভি-ব্লু পর্দা। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল পর্দার উপর আর্চওয়ের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফোকরটা দিয়ে ড্রইংরুমের দেওয়ালটা দেখা

যায়। সেই দেওয়ালের বড় ছবিটার উপর নজর পড়ল পরমানন্দের। দিল্লী-দরবারের ছবি। প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ দিল্লীর দরবারে এসেছেন। ডাইনিং রুমের বিভিন্ন আসবাবের উপরেও নজরটা বুলিয়ে নিলেন। স্বদেশী জিনিস কই নজরে এল না তো কিছু। ক্রকারিস বিলাতী, ফ্রিজিডেয়ার বিলাতী, মায় মীটসেফটা পর্যন্ত বিলাতী ফার্নিচারের দোকানের সীলমোহর নিয়ে এসেছে ললাটে। এর মাঝখানে চৌধুরী-তনয়ার এ বিদ্রোহীর বেশ শুধু বিসদৃশ নয়, বিপ্লবাত্মক। পরমানন্দ মনে মনে ভ্রূ কুঞ্চন করলেন। বাইরে তাঁর অশান্ত সমাহিত মূর্তিতে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। মিস গ্রেহাম একবার চোখ তুলেই মনোনিবেশ করলেন কফির পটে। প্রতিদিন এ কাজটা ছিল নীলার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত; আজ কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল সে।

অসীম বলে- শীত তো এখনও তেমন পড়ে নি, এরই মধ্যে গরম জামা বার করেছিস যে নীলা?

নীলা ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নত করে দৃষ্টি। বলে—এটা গরম জামা নয়, খদ্দর।

—ঐ একই কথা!

পরমানন্দ খবরের কাগজটা দিয়ে একটা ব্যবধান রচনা করলেন—যেন কাগজের দুর্গে আত্মরক্ষা করতে চাইলেন তাঁর বিদ্রোহী আত্মজার আসন্ন প্রত্যুত্তরের তিক্ততা থেকে।

নীলা কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিল—জামা মোটা-সরুর তো কোনও মাপকাঠি নেই দাদা—ওটা আপেক্ষিক। আমার গায়ে এটা খুব মোটা কাপড়ের মনে হচ্ছে না। আবার হয়তো অনেক মোটা চামড়ার লোকের গায়ে বিলাতী সিল্কের জামাও অসহনীয় মনে হতে পারে।

অসীম অহেতুকভাবে তার সিল্কের পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলতে খুলতে বলে—তা ভালো, নরম চামড়া তোদের, এ চেঞ্জ-অফ-ক্লাইমেটের সময় ঐ চটের জামা পরাই ভালো।

নীলা বলে—চেঞ্জ-অফ-ক্লাইমেট নয় দাদা, চেঞ্জ-অফ-কণ্ডিশন্স,.... চেঞ্জ অফ ইডিওলজি।

পরমানন্দের গলায় কি রুটির টুকরোটা আটকে গেল! হঠাৎ কেশে উঠলেন উনি।

—তোমাকে আর এক পীস কেক দেব নীলা?—প্রশ্ন করলেন মিস গ্রেহাম। উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়া।

নীলা বেণীসমেত মাথাটা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানায়। খাওয়া তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। শাড়ির আঁচলটা সামলে নিয়ে সে চলে যায় ড্রইং রুমের দিকে। রেডিওতে সকাল বেলাকার খবর পরিবেশিত হচ্ছিল সে ঘরে। হঠাৎ আর্তনাদ করে থেমে গেল সেটা। বোঝা গেল নীলা থামিয়ে দিল তার যুদ্ধপ্রচারের প্রচেষ্টা।

পরমানন্দ একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, ইট্‌স্ এ ব্যাড ওমেন!

মিস গ্রেহাম কোনও জবাব দেন নি। দিয়েছিল অসীম। হেসে বলেছিল—তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ বাবা। এ বয়সে ও রকম ভাবালুতা এক-আধটু সবারই হয়। কদিন? শীতকালের কটা মাস কাটুক—তারপর খদ্দর ছাড়তেই হবে। তা ছাড়া এখন সিনেমা বন্ধ—পার্টি হয় না—ফ্যাকটরির ক্লাবেও কোনও ফাংশান হচ্ছে না—এখন খদ্দর চলতে পারে কিছুদিন। তাই বলে মেয়েমানুষ কখনও শাড়ি-গহনার মোহ ছাড়তে পারে?

পরমানন্দ ওকে চোখের ইঙ্গিতে চুপ করতে বলেন। নীলা পাশের ঘরেই আছে। দুটি ঘরের মাঝখানে খোলা আর্চওয়ে দিয়ে এ পাশের কথা ও পাশ থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। অভিমানিনী মেয়েটির কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন চৌধুরী। অসীম চুপ করে।

পরমানন্দের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, অনতিবিলম্বেই তা বুঝতে পারা গেল। হঠাৎ ঘরে এসে ঢোকে বৈশাখী; মিস গ্রেহামকে উদ্দেশ করে বলে—গ্র্যানা, শিগ্‌গির আসুন—নীলা খেপে গিয়ে কি করছে, দেখুন।

ওঁরা সকলেই উঠে এসেছিলেন প্রাতরাশের টেবিল থেকে। বাড়ির ভিতর দিকের উঠোনে নীলা খাণ্ডবদাহন শুরু করেছে। আলমারি

খুলে নিজের সমস্ত বিলাতী শাড়ি একত্র করে তাতে আগুন দিয়েছে। নন্দ-বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে বোকার মতো বারান্দার ওপ্রান্তে। কোমরে হাত দিয়ে নীলাও দাঁড়িয়ে আছে সে অগ্নিকুণ্ডের সামনে—যেন ঐ হোমাগ্নির আলোক-উত্তাপে তার চিত্তশুদ্ধির আয়োজন চলেছে গোপনে গোপনে।

মিস গ্রেহাম ছুটে এসে চেপে ধরেন নীলার হাত—এ কি করছ নীলা! দুদিন পরে তোমার যে অনুশোচনার অবধি থাকবে না।

নীলা ছাড়িয়ে নেয় হাতখানা, বলে—আমি দুঃখিত গ্র্যানী; জানি তোমার মনে আঘাত লাগবে। তবু এটা আমার কর্তব্য।

অগ্নিস্তূপের ভিতর থেকে কয়েকটা মূল্যবান শাড়ি বাঁচাবার জন্য ছুটে যায় অসীম আর বৈশাখী। পরমানন্দ বাধা দেন তাদের; ও জিনিসগুলো ওর নিজস্ব।

ধীরপদে ড্রইংরুমে ফিরে আসেন উনি।

মিস গ্রেহাম এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছেন নীলাকে। চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আজ তাঁর হঠাৎ মনে হল—যে পক্ষিশাবককে এত যত্ন-আদরে মানুষ করে তুলেছেন, আজ সে মুক্তপক্ষ নীলাকাশচারী। নীড়ের সঙ্গে সম্পর্কটা সে অস্বীকার করতে চায়। নীলা আর গ্রেহাম আর নাতনী-দিদিমা নয়—দুটি ভিন্নদেশী নারী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের! নেভার দ্য টোএন্ শ্যাল্ মীট্।

পরমানন্দ ওঁকে বলেন—আশা করি তুমি ওকে ক্ষমা করেছ—ও যা কিছু করছে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে না ভেবেচিন্তেই করছে।

—বাট্...বাট্...সাম অফ্ দেম আর হার মাদার্স মেমেণ্টো।

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন গ্রেহাম। সত্য কথা। যে শাড়িগুলি জাত্যভিমানের বিদ্বেষবহ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—সেগুলি যে শুধু বিলাতী মিলের তৈরী সেটাই তো শেষ কথা নয়। সেগুলি যে অন্য একটি অভারতীয় রমণীর স্মৃতিবিজড়িত। ঐ শাড়িগুলি আহরণ করে এনেছিল যে নারী সে ছিল একদিন এই চৌধুরী পরিবারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী;—শুধু তাই নয়, এগুলি সে দিয়ে গিয়েছিল তারই

আত্মজাকে। নীলা আজ শুধু গোটা পশ্চিম খণ্ডকে অপমান করে নি—সে ধূলায় টেনে এনে নামিয়েছে তার মাতৃস্মৃতিকে। মিস গ্রেহামের মানসকন্যা মিসেস অ্যারিঅ্যাডনি চৌধুরীর দ্বিতীয়বার মৃত্যু ঘটল আজ এ বাড়িতে—এবং এবারকার মৃত্যুটা অপঘাতজনিত। পাকা আমটির মতো টুকটুকে গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে বুড়ী মেমের।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা পরমানন্দের। কিন্তু বাধা তিনি দিতে পারেন নি নীলাকে। কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

স্কুল-কলেজ বন্ধ। আদালত-দোকান দীর্ঘদিন রুদ্ধদ্বার। শহরের বুকে চলেছে বিভীষিকার রাজত্ব। কখনও বন্দুকের আওয়াজ, লাঠি, মেদিনীবিকম্পিতকরা সদর্প সবুট পদক্ষেপ—কখনও বন্দেমাতরম্-মন্ত্রোদ্ভাসিত নিরস্ত্র জনতার মিছিল।

ড্রেসিং-গাউন-পরা পাইপমুখো চৌধুরীসাহেব দ্বিতলের ব্যালকনিতে অশান্ত চরণক্ষেপে পদচারণ করে চলেন। তিনি কোনও পক্ষে নেই। এ সংগ্রামের গতি তিনি দ্রষ্টা সঞ্জয়ের মতো নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করে চলেছেন শুধু। কোনও মতামত প্রকাশ করেন না কারও কাছে এ বিষয়ে। কালপ্রবাহের উপকূলে বসে শুধু নিরীক্ষণ করে চলেছেন কালের গতি। সে প্রবাহে, লক্ষ্য করেছেন চৌধুরী, তাঁর পুত্রকন্যাও যাত্রা করেছে পালতোলা নৌকায়। দুজনে দু মুখে। একজন ভাঁটিতে একজন উজানে।

ছেলেরা দল বেঁধে একদিন দেখা করতে এল ওঁর সঙ্গে। শহরের কয়েকজন নামকরা বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছেন দলে।

—কি চাই?

—এতদিন যা করেছেন করেছেন, এবার আপনাকে চালটা পাল্টাতে হবে।

—অর্থাৎ?

—স্বদেশী জিনিস আপনার বাড়িতে কোনদিন আসে নি। সমস্ত বিলাতী জিনিস। এ-সব আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।

—রিয়ালি? তা আমি যে-সব জিনিস ব্যবহারে অভ্যস্ত তা আপনাদের দেশী কারখানায় বানিয়ে দিতে পারবেন তো?

না পারি ব্যবহার করবেন না তেমন জিনিস। দেশী জিনিসটাকে ত্যাগ না করে বদ অভ্যাসটাকেই ত্যাগ করুন না কেন।

—আমি এ কৃচ্ছসাধনের বিনিময়ে কি পাব?

—স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি।

হোহো করে হেসে ওঠেন পরমানন্দ!

শেষে হাসি থামিয়ে বলেন—এ প্রতিশ্রুতি তো নতুন নয়। প্রতিবারেই কতকগুলি ছেলে জেল খেটেছে কতগুলো মরেছে গুলি খেয়ে—অথবা ফাঁসিকাঠে! কত সংসার ছারখার হয়ে গেল। আবার সে প্রতিশ্রুতি কেন? হিমালয়ের চেয়ে বড় কিছু তো নজরে পড়ছে না—তা সে হিমালয়ান ব্লাণ্ডারও তো হয়ে গেছে একদফা!

দলের সামনে যে ছেলেটি ছিল—রুক্ষচুল, খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, সে বলে– সেবার প্রতিশ্রুতি কেন রক্ষা করা যায় নি জানেন? কারণ সেবারকার সংগ্রামের সংবাদটা আমরা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারি নি। আমাদের দেশে, জানেন তো, একজাতের শিক্ষিত মানুষ আছেন যাঁরা বছরে মাত্র দুদিন খবরের কাগজের পাতা ওলটান। রাজার জন্মদিনে আর নববর্ষে। তাঁদেরই মহানুভবতায় আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেছে বারেবারে।

যে সময়ের কথা তখন অনেকেই আশা করত আগামী বারে ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরীর নাম দেখা যাবে লিস্টে। খোঁচাটা তাই অনেকেই বেশ উপভোগ করল।

শহরের আর একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন,--আপনি আমাদের শহরের একজন নামকরা লোক। আপনার ঘরে আজকের দিনেও যদি ঐ ছবিখানা টাঙানো থাকে তবে সেটা এ শহরেরই অপমান।

পরমানন্দ জবাবে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যান। হঠাৎ লক্ষ্য হল একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে নীলা দিল্লী দরবারের ছবিখানি নামিয়ে রাখছে। পরমানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে জনতার দৃষ্টি গিয়ে

পড়ে নীলার উপর। সদ্য স্নান করে এসেছে বোধ হয়—খোলা চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বাঙ্গ শুভ্র খদ্দরে বিমণ্ডিত।

কে একজন আনন্দে চীৎকার করে ওঠে—বন্দেমাতরম্!

বাইরে অপেক্ষমান জনতার কণ্ঠে ওঠে প্রতিধ্বনি।

পরমানন্দ হাত দুটি বুকের কাছে যুক্ত করে বলেন, আশাকরি আপনারা তৃপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ ভদ্রভাষায়—এবার আপনারা যেতে পারেন।

সেই ছেলেটি বলে, আর একটা কথা। ঐ যে বিদেশী মহিলাটি আপনার বাড়িতে আছেন—ওঁকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—কেন?

—কুইট-ইণ্ডিয়া হচ্ছে আমাদের মন্ত্র। উনি বিদেশিনী।

—উনি মানুষ।

কে একজন বলে—কবি বলেছেন, 'দেশের কুকুর পুজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া—'

—বটে! আমি তো জানতাম কবি বলেছেন, 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি—সে জাতির নাম মানুষ জাতি!'

সামনের ছেলেটি উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে—আমরা এখানে কবির লড়াই শুনতে আসি নি। আপনি ওঁকে তাড়াবেন কিনা বলুন।

—না! আর শুধু না নয়, ও ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে আমি আপনার কোনও অভদ্র ইঙ্গিত বরদাস্ত করতে রাজী নই। আপনারা এবার আসতে পারেন।

—আপনি পছন্দ না করলেও এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা চালাতে হবে। আপনি ওঁকে তাড়াতে রাজী না হলে বাধ্য হয়ে—

—ব্যস্!

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের টানা ড্রয়ার খুলে কালো রঙের ছোট্ট জিনিসটা উনি তুলে নিলেন হাতে: আউট, আউট য়ু ভ্যাগাবণ্ডস্!

—ভ্যাগাবণ্ডস্! আচ্ছা দেখা যাবে! লোকগুলো গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল।

মিস গ্রেহাম এসে বলেন —তুমি কেন ওদের বললে না যে, আমাকে কোনও ইংরাজ অথবা আমেরিকানের আশ্রয়ে পৌঁছে দিলে আমি দেশে ফিরে যেতে রাজী আছি।

পরমানন্দ ওঁকে সান্ত্বনা দেন, বলেন—এরা সব কাউয়ার্ডস্। আর ভিড়বে না এদিকে। ওদের কথায় কিছু মনে কোরো না।

—তা আমি জানি। কিন্তু শুধু বাইরেই তো নয়—ঘরেও যে আমি অবাঞ্ছিতা বিদেশিনী।

পরমানন্দ এ কথার জবাব দিতে পারেন নি।

সে লোকগুলো সত্যিই আর ফিরে এল না। তবে দেখা করতে এলেন ননীমাধব রায়। বার্টন অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানির বড়বাবু, রাজভক্ত প্রজা তিনিও পরমানন্দের দীর্ঘদিনের বন্ধু। প্রথম থেকেই লেগে আছেন ফ্যাকটরিটার সঙ্গে। ওরই কল্যাণে ননীমাধবের সংসারের শ্রীবৃদ্ধিটাও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। ইংরাজ অফিসারদের ঠিকমতো তোয়াজ করে আখের গুছিয়ে নিতে ভুল করেন নি তিনি। শহরের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। বার্টন অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানিতে বাঙালী অফিসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। কোম্পানির আদি পর্ব থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন উপরে—এমনি একাদিক্রমে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকলে স্বর্গারোহণ পর্বে সত্যই স্বর্গে গিয়ে পৌঁছবেন একদিন। শুধু চৌধুরীর সঙ্গে নয়—চৌধুরী পরিবারের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। সরকারী মহলে, থানায়, এস. ডি. ও. সাহেবের খাস কামরায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনা এত্তেলাতেই ঢুকে পড়েন তিনি। আর্দালিগুলো পর্যন্ত এমনই চিনে গেছে তাঁকে।

রায়মশাই এসে সদুপদেশ বর্ষণ করতে শুরু করেন চৌধুরী সাহেবের উপর। প্রতিবেশীর ছেলেটা যখন বখে যাবার পথে পা বাড়ায় তখন সে সংবাদটা তার অভিভাবককে জ্ঞাপন করে সদুপদেশ দিতে আসার মধ্যে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি আছে। ননীমাধব কিন্তু সত্যই হিতৈষী ছিলেন এ পরিবারের। উনি চৌধুরীকে জানালেন সব কথা। অসীমকে নাকি একটা আধময়লা পায়জামা পরে রীতিমতো কুলিবস্তিতে আজকাল

ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এত বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলের এ আচরণ ক্ষমা করা যায় না। বেশ ঘনিয়ে বসে শুরু করেন উনি—সেদিন তো, বুঝলে, বড় সাহেব আমাকে ডেকে বলেই বসলেন, 'রায়, তুমি ডক্টর চৌধুরীকে আমার নাম করে বুঝিয়ে বলো--এটা বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে। একটা সফিস্টিকেটেড ঘরের ছেলে শেষকালে কুলি ব্যারাকে গিয়ে ধর্মঘটের ইন্ধন জোগাবে?' আমি বললাম, বুঝলে, 'এ তুমি কি বলছ সাহেব? চৌধুরী আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ওদের সংসারের নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত আমার নখদর্পণে। ও-সব গান্ধাইট ফুলিশনেস ওদের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারে না। অসীমকে তুমি চেন সাহেব। এস ডি ও. ওকে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কি-যেন-একটা করে দিয়েছেন। অসীম করবে ধর্মঘটের আয়োজন? ইম্পসিবল! অ্যাবসার্ড। এই জনযুদ্ধ জেতবার জন্য ওদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ওদের পার্টি কখনও নেমকহারামি করবে না, দেখো!' সাহেব, বুঝলে, মনে হল মেনে নিল আমার কথাটা। আর তা ছাড়া কথাটা তো মিথ্যাও নয়। কিন্তু আমি কি বলি জান? জনযুদ্ধের কাজ করতে চাও তা ভদ্রভাবে কর না কেন? কাজটা তো ভালোই। আখেরে উপকার হবেই। বেটারা নির্ঘাত যুদ্ধ জিতবে—সুতরাং যারা সাহায্য করবে তাদেরই হবে পোয়া বারো—আর যারা এই বিপদের সময় পিছন পিছন ফেউ ডেকে বেড়ালো তাদের দফা-রফা হবে যুদ্ধ থামলে!

পরমানন্দ বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। আপন মনে কি একটা কথা ভাবছিলেন তিনি। সেটা লক্ষ্য হল ননীমাধবের। হঠাৎ গলাটা খাটো করে উনি বলতে শুরু করেন—আমি কিন্তু তোমাকে অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম ভাই। জানি না, তুমি কিভাবে নেবে কথাটা। তবু, বুঝলে, যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি তাই কথাগুলো বলছি।···তুমি নীলাকে এবার সামলাও।

ননীমাধবের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, নীলা আজকাল রীতিমতো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে নাকি। খদ্দর পরে ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। সেদিন নাকি ছাত্রদের কোন একটা মীটিঙেও তাকে

উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। ননীমাধব আরও বলেন—থানার ও. সি. মজুমদার সেদিন আমাকে বললে, বুঝেছ, তোমাকে একটু টিপে দিতে। বলে, তোমার ঘরের দিল্লী দরবারের ছবিখানা নাকি সে-ই সবার সামনে টেনে নামিয়েছে। তা, আমি বললুম. তা ছাড়া আর কি করতে পারত সে? হাজার খানেক লোক গিয়ে যদি কারও বাড়িতে চড়াও হয় তো মানুষে আর কি করবে? অত যদি আধিক্যেতা তোমাদের তাহলে শহরে যে কজন রাজভক্ত প্রজা আছে তাদের বাড়ির সামনে পেট্রল গার্ড বসাও তোমরা। দেখি, কে এসে ছবি নামায়। না কি বল?

এবারও জবাব দিলেন না পরমানন্দ।

—ছবিখানা আর টাঙাও নি দেখছি।

—না।

—ভালোই করছে। ও হাঙ্গামা-টাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর আবার টাঙালেই চলবে। আমার বাইরের ঘর থেকেও, বুঝলে, রাজা-রানীর ছবি দুটো খুলে এনে শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়েছি। আর একটা কথা ভাই, কিছু মনে কোরো না, ঐ গ্রেহাম বুড়ীকে কিছু দিনের জন্য কোনও বিলাতী হোটেলে-মোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না?

পরমানন্দ হেসে বলেন—না, যায় না।

কেন যায় না সে প্রশ্নটা আর করলেন না ননীমাধব। তবু অন্য প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপন করেন উনি। বস্তুত নীলার ভবিষ্যৎ নিয়ে ননীমাধব অনেকদিন আগে থেকেই ভাবছেন। আকারে ইঙ্গিতে জিনিসটা বুঝিয়েও দিয়েছেন চৌধুরীকে। মনে হয় তাঁর আগ্রহ আছে ওতে। না থাকবেই বা কেন? দীপক সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয় পাত্র। নীলা যদি পুত্রবধূরূপে আসে একদিন ননীমাধবের সংসারে তাহলে কোনও পক্ষেরই আপত্তি নেই। সুতরাং ননীমাধব নীলার প্রসঙ্গটা আবার উত্থাপন করেন—কিন্তু নীলুমাকে তুমি একটু সাবধান করে দিও ভাই।

পরমানন্দ এতক্ষণে পেশ করেন নিজের বক্তব্য—তুমি ভুল করছ

ননীমাধব। 'আমার বাড়িতে আমি ডিকটেটর নই—এ ডেমোক্রাটিক সংসারে আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চিরকাল মেনে এসেছি। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়েছি, বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে তাদের—যে পথে তারা চলতে চায় চলুক, আমি বাধা দেব না। তবে কোন পথে চলার কি ফলাফল তা আমি ওদের বুঝিয়ে দিই। অপরের মত মাথা নত করে জীবনে কখনও মেনে নিই নি, অপরের উপরে কখনও নিজের মতামতও চাপাতে চাই না আমি।

ননীমাধব জেরা শুরু করেন, অপরের কথায় ছবিখানা কেন নামালে তাহলে দেওয়াল থেকে?

—ছবিখানা আমি নামাই নি।

—কিন্তু তুমিই তো গৃহকর্তা, তোমার অমতে তো

—না। আগেই বলেছি, এ সংসারের ডিকটেটর নই আমি। এ বাড়ির দেওয়ালে কোন ছবি টাঙানো হবে—সেটা যদি একমাত্র আমার হুকুমেই স্থির করা হয়—তাহলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর মানলাম কোথায়?

এইসব ছেঁদো কথা বরদাস্ত হয় না ননীমাধবের। প্র্যাকটিক্যাল মানুষ তিনি। এ যেন বাড়াবাড়ি। ঘর-সংসার তো তিনিও করছেন—তিনিও তো সন্তানের জনক। তবে এ-সব পাগলামি নেই। ছেলেমেয়ে হল দুষ্টু ঘোড়া, মুখে সব সময় কড়া লাগাম লাগিয়ে চপটি উঁচিয়ে না থাকলেই ওরা বেচালে চলবে। এই তো দীপক,—অসীমেরই সহপাঠী। তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি বন্ধুর নামগোত্র হদিস-হিসাব ননীমাধবের নখদর্পণে। বাপের অমত তো দূরের কথা—বাপ অপছন্দ করতে পারেন এমন কোনও কিছুর দুঃস্বপ্ন দেখবার সাহস নেই দীপকের। কিন্তু কি অদ্ভুত ঐ লোকটি। নিজের ভালোমন্দ বোঝে না। অনুধাবন করে না, সন্তানের মঙ্গল হবে কিসে। সে কথাই বোঝাতে যান উনি—কিন্তু ওটা তুমি ভুল করছ না কি চৌধুরী? ওরা অপরিণতবুদ্ধি। নিজের ইচ্ছায় ওদের চলতে দিলে ওরা তো ভুল পথেও যেতে পারে।

পরমানন্দ জবাবে বলেন—আমার বাবার সঙ্গে আমার মতের মিল হয় নি। যে পথে আমি চলতে চেয়েছিলাম তিনি সে পথে আমাকে চলতে দেন নি। তাঁর মতটাও এদিকে গ্রহণ করতে পারি নি আমি মনেপ্রাণে। ফলে না রাম না রহিম, কোনও আদর্শই টিকিয়ে রাখতে পারি নি। সে ভুল আমি করব না আমার সন্তানের বেলায়।

ননীমাধব প্রশ্ন করেন—কি চেয়েছিলেন তোমার বাবা ?

—আমি বড় ডাক্তার হব জীবনে।

—আর তুমি কি চেয়েছিলে ?

হাসলেন চৌধুরী ডাক্তার। ননীমাধব বুঝতে পারেন আরও বড় কিছু হবার আদর্শ ছিল নিশ্চয়ই পরমানন্দের। সে লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পারেন নি। পাছে হাস্যকর মনে হয়, তাই সে কথা নিকট বন্ধুর কাছেও আজ স্বীকার করতে পারছেন না। তাই বলেন—কিন্তু তুমি তো তোমার বাবার ইচ্ছা পূরণ করেছ। জীবন তো তোমার ব্যর্থ হয় নি ভাই। কোথাও কোনও অপূর্ণতা নেই তো তোমার জীবনে।

এবারেও হেসে নীরব রইলেন পরমানন্দ।

ননীমাধব বুঝতে পারেন মনের কোনও গোপন কন্দরে ব্যর্থতার বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার চৌধুরী। ধন-সম্পত্তি, প্রতিপত্তি, যশ—সবই পেয়েছেন প্রচুর, তবু তৃপ্ত নন তিনি। আরও বড় কিছু হতে চেয়েছিলেন বোধ হয়। কী সে ? আই সি এস. চাকরি ? কাউন্সিলার-শিপ ? প্রসঙ্গটা পালটে নেন উনি আপাতত · আচ্ছা চৌধুরী, আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলবে ?

—বলো।

—মহাত্মা গান্ধী কি বলে গেছেন এইসব হাঙ্গামা করতে ? এ কি সম্ভব ? তোমার কি মনে হয় ?

—আমি জানি না কিছু।

—আহা, তা তো বটেই। আমি বলছি, তোমার কি মনে হয় ? আমাদের এখন কি করা উচিত ?

—তোমার বিবেক যা বলে।

হঠাৎ চটে ওঠেন ননীমাধব—এইজন্যেই তোমার উপর রাগ হয় চৌধুরী। প্রাণ খুলে কথা বল না কেন তুমি?

আবার সেই গা-জ্বালানো হাসি।

দিন কেটে যায়।

অসীম একদিন বাপের হাতে এনে দিল একতাড়া কাগজ—এগুলো নীলার বিছানার তলায় পাওয়া গেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় পরমানন্দের। নিষিদ্ধ প্রচার-পুস্তিকা। দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ করার নির্দেশ আছে তাতে। কর্মসূচির একটা লম্বা ফিরিস্তি। তলায় কংগ্রেসের বড় বড় নেতার নাম। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড প্রেস থেকে ছাপা।

অসীম উত্তেজিত হয়ে বলে—নীলাকে তুমি সাবধান করে দাও বাবা। তা ছাড়া আজকাল ও যে-সব জায়গায় যাতায়াত করে—যাদের সঙ্গে মেশে—তাতে আমার সন্দেহ হয় ও আমাদের বংশের নাম ডোবাবে। ওদের পার্টির কয়েকটি ছেলেও আসে এ বাড়িতে নীলার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে।

পরমানন্দ বিচলিত হয়েছিলেন কিনা বোঝা যায় না কিন্তু উত্তেজিত তিনি হয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন তিনি অসীমকে—তুমি কি করে জানলে? তুমি নিজে দেখেছ?

—না, আমি নিজে দেখি নি, বৈশাখী দেখেছে।

পরমানন্দ বৈশাখীকে ডেকে পাঠালেন। এসে দাঁড়াল মেয়েটি। নীলার চেয়ে বয়সে দু-এক বছরের বড়ই হবে। দেখলে কিন্তু নীলাকেই বড় বলে মনে হয়। নীলা ধীর, গম্ভীর—বয়সের অনুপাতে গাম্ভীর্য তার বেশী। এদিকে বৈশাখী চঞ্চলস্বভাবা, ওর খঞ্জন নয়ন দুটি সর্বদাই চঞ্চল হয়ে ঘুরছে আশেপাশে। এ পরিবারেরই মানুষ বৈশাখী। পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় সে পরমানন্দের হাসপাতালের বেতনভুক

যেতে ... কিন্তু তা ছাড়াও তার একটা আলাদা পরিচয় আছে। সে বৈশাখী পরিবারভুক্ত লোক। আরও একটা পরিচয় আছে

বৈশাখীর—কিন্তু সে পরিচয় অসীম আর বৈশাখী ছাড়া আর কেউ জানত না।

পরমানন্দ দু-একটি প্রশ্ন করলেন ওকে। তারপর তাকে বিদায় দিয়ে ডেকে পাঠালেন নীলাকে। এসে দাঁড়াল নতনয়না মেয়েটি। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী দেখলেন পরমানন্দ। তারপর বললেন—এ কাগজগুলো তোমার বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেছে।

নীলা একবার চোখ তুলেই মুখটি নিচু করে। মুখটা রক্তশূন্য হয়ে যায় ওর।

— এ-সব জিনিস অমন অসাবধানে রাখতে নেই। যাও।

ভয়ে নীল-হয়ে-যাওয়া নীলার হাতের মধ্যে গুঁজে দেন কাগজের বাণ্ডিলটা। নীলা চলে যায় দ্রুতপদে।

অসীম অনেকক্ষণ কোনও কথা খুঁজে পায় না। শেষে বলে—এটা কি ঠিক হল? শেষে ওকেই দিলে কাগজগুলো?

—তুমি যে বললে ওগুলো নীলার।

অসীমের বিস্ময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বলে, কিন্তু ওকে সাবধান করে দিলে না? শাসন করলে না?

— সাবধানই তো করে দিলাম। আর শাসন আমি কাউকে করি না। তোমরা বড় হয়েছ, বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে। নিজের বিবেক অনুযায়ী তোমরা যে যার আদর্শে চলবে এই আমি চাই।

—তার মানে নীলার এ-সব অপকীর্তিতে তোমারও গোপনে সমর্থন আছে?

না, নেই। যেমন নেই তোমার 'জাপানকে রুখতে হবে' যুক্তিতে। কিন্তু এ বাড়িতে কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি হাত দিতে চাই না। যে যার কর্তব্য করে যাব আমরা।

অসীমের কণ্ঠে এবার রূঢ়তার আমেজ—বুঝলাম! এটা জানা ছিল না আমার। তুমিও তা হলে ঐ দলে।

—খোকা!

—বেশ! কিন্তু আমার যদি মনে হয় নীলার এই খবরটা আমার

দিয়ে আসা উচিত—তাহলে আশা করি তুমি আপত্তি করবে না। আমার সে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না আশা করি।

পরমানন্দ মৃদু হেসে বলেন—না।

—ভালো কথা।

দুম দুম করে পা ফেলে অসীম চলে যায়।

মনে মনে এবার একটু বিচলিত হয়ে পড়েন পরমানন্দ। পাগল ছেলেটা সত্যিই একটা কেলেঙ্কারি করে বসবে না তো? বিশ্বাস হয় না তাঁর। অসীম ছেলেমানুষ নয়। এ কাজের ফলাফল কী ভয়াবহ হতে পারে এ কথা না বুঝবার নয়। নিজের ঐ বয়সটার কথা মনে পড়ে যায়। নিজের বাপের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ বেধেছিল তাঁরও। অসীমকে যতটা স্বাধীনভাবে পথ চলতে দিচ্ছেন তিনি, অতটা স্বাধীনতা জোটে নি নিজের বেলা। যা কিছু করতে হত—তা গোপনেই সারতে হত। ডাক্তারি পড়বার জন্য যখন তিনি প্রবাসযাত্রা করেন তখনও তাঁর বাবা জানতে পারেন নি কেন তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন ডাক্তারি পড়তে। কোনদিনই তা আর জানতে পারেন নি।

দিন কেটে যায়। বাড়ির আবহাওয়াটা অসহনীয়। নীলা আর অসীম পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। প্রাতরাশের টেবিলে মিস গ্রেহামের কাছে শুনতে পান অসীম আগে খেয়ে নিয়েছে অথবা নীলা পরে খেতে আসবে। বস্তুত দুজনের কারও সাক্ষাৎ পান না আর পরমানন্দ। এ বাড়িতে এটা রীতিবিরুদ্ধ। দিনের মধ্যে দুবার এক টেবিলে আহার গ্রহণের একটা অলিখিত আইন অলঙ্ঘনীয় বলে মেনে নিয়েছিল এ সংসার। সকাল সাতটায় প্রাতরাশ এবং রাত্রি সাড়ে আটটায় ডিনার। মধ্যাহ্নে আহারটা অবশ্য একত্র সম্ভব ছিল না। ছেলেমেয়েরা সকালে খেয়ে স্কুলে কলেজে চলে যেত—চৌধুরী খেতে আসতেন বেলা দ্বিপ্রহরে। এখন শুধু প্রাতরাশ নয়, রাত্রের ডিনার টেবিলেও একত্র আহারটা ঘটে ওঠে না দেখা যাচ্ছে। অসীমের রাত হয়—কোনদিন নটা দশটা, কোনদিন বা আরও গভীর রাত্রি। নীলা যেন নিজেকে

একেবারে গুটিয়ে ফেলেছে। পরমানন্দকে তুজনেই পরিহার করে চলছে।

গ্রেহাম বুড়ী মাঝে মাঝে এসে বলে—এবার আমাকে ছেড়ে দাও চৌধুরী। তোমার হাসপাতাল আমার মতো বুড়ীকে বাদ দিয়ে চলতে পারবে এখন। এবার আমি অন্য কোথাও চলে যাই।

পরমানন্দ প্রতিবাদ করেন। বুড়ী মেম তখন আসল কথাটাই ভেঙে বলে আমাকে ভুল বুঝো না চৌধুরী, আমার অবস্থা হয়েছে ডাঙায় তোলা মাছের মতো। এখানে আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

চৌধুরী আর আপত্তি করতে পারেন না। বেশ, শেষ জীবনটা তিনি যেখানে যেভাবে কাটাতে চান সেই মতোই ব্যবস্থা করা যাবে না হয়। যুদ্ধের ডামাডোলটা একটু কমলেই ওঁকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল চৌধুরীর। নিজেকে আবিষ্কার করলেন নিঃসঙ্গ প্রাতরাশ টেবিলে। ক্রিরিং ক্রিরিং উঠতে হল অগত্যা।

সিল্কের ড্রেসিং গাউনটার পাকানো কর্ডটা আলগা করে মাজায় বাঁধতে বাঁধতে চলে আসেন আর্চওয়ের তলা দিয়ে ড্রয়িং রুমে। রিসিভার থেকে তুলে নিলেন টেলিফোনটা।

—চৌধুরী!

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল উদ্‌বিগ্ন ননীমাধবের উৎকণ্ঠ ব্যস্ততা—বেশ যা হোক। আটটা বেজে গেল তোমার পাত্তা নেই। কি করছ? দেরি করছ কেন?

পরমানন্দ প্রতিপ্রশ্ন করেন—কেন? কোথায় যাব?

—কোথায় যাবে?—ননীমাধব আর্তনাদ করে ওঠেন—সে কি হে? কাল রাত্রে ক পেগে থেমেছিল বলো তো? এখনও খোলসা হয় নি মাথা?

বিরক্ত বোধ করেন চৌধুরী। কাল রাত্রে সত্যিই মাত্রাতিরিক্ত পান করেছেন নীলা চলে যাবার পর। কিন্তু সেজন্য বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি

ওঁর। এ নেশা ওঁর নূতন নয়। বললেন—বাজে কথা বোলো না। কোথায় যেতে বলছ এখন?

ওঁর কণ্ঠস্বরে ননীমাধব কিন্তু বিচলিত হন না। বলেন,—সকালবেলা উঠে এনগেজমেণ্ট প্যাডটাও দেখ নি খুলে? কেমন? শোনো, মুখস্থ বলে যাচ্ছি আমি—সকাল সাড়ে আটটায় বোর্ড-অফ ডাইরেকটর্সদের মীটিঙ—সাড়ে দশটায় জিতেনবাবুর বাসায় যাওয়ার কথা আছে—তাঁকে সঙ্গে করে এগারোটায় তারিণীদার বাসায়—মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ আছে তোমার সেখানে—ও বেলায় ধরো, মিউনিসিপ্যাল হলে সাড়ে তিনটের শোকসভাতে গিয়ে একটা কাঁপা কাঁপা গলায় ভাষণ দিতে হবে—সেখান থেকে সাড়ে চারটায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে। মনে পড়ছে কিছু? তারপর ধরো…

ছি ছি ছি! কী মারাত্মক ভ্রান্তি! সব কথা মনে পড়ে যায় পরমানন্দের। তাঁর দিনগুলি কি আর তাঁর নিজের? আপন খেয়ালখুশিতে ফেলে-আসা দিনগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে তন্ময় হয়ে যাবার অবকাশ কোথায়? প্রতিটি ঘণ্টা প্রতিটি মুহূর্ত যে কঠিন কর্মসূচির শৃঙ্খলে বন্দী। সামনের আয়নাটায় প্রতিবিম্ব পড়েছে নিজের। চমকে ওঠেন দেখে। দাড়ি কামানো হয় নি, স্নান হয় নি, জামা-কাপড় বদলানো হয় নি। আশ্চর্য, এ-সব না সেরেই তিনি প্রাতরাশের টেবিলে এসে বসেছিলেন? জীবনে অনেক ভুল করেছেন তিনি—ভুলের মাশুলও দিয়ে এসেছেন কড়াক্রান্তি হিসাবে; কিন্তু, মনে হল ডাক্তার চৌধুরীর, এত বড় ভ্রান্তি বুঝি এই প্রথম। ঘড়ির কাঁটার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা দৈনন্দিন কর্মসূচি আজ বুঝি প্রথম আগল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে অনিয়মের অরাজকতায়। নাঃ! এ দুর্বলতাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না।

—কি হল, তুমি আসবে, না আমিই যাব তোমার ওখানে?

—না, না, আমিই যাচ্ছি—গাড়ি বার করতে বলছি।

—যাক, গাড়িটা ফেরত পেয়েছ তা হলে?

—ও না, গাড়ি তো এখানে নেই। তাহলে তুমিই বরং এসো। আমি ততক্ষণ তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

—তোমার কি হয়েছে বলো তো?

জবাব না দিয়ে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন। নন্দ এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। তাকে বলেন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে। ফ্রিজিডেয়ার খুলে জলের বোতল আর গ্লাসটা বার করে আনে নন্দ। ঢকঢক করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিলেন প্রথমেই।

তৈরী হয়ে নিতে অবশ্য সময় লাগল না। যন্ত্রের মতো কাজ করে গেলেন উনি। চাবি টিপে দেবার পর মেটিরিয়ালগুলো যেমন 'কাটার' থেকে 'ক্রাশার' যন্ত্রে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে—আর অনায়াস গতিভঙ্গে শেষ পর্যন্ত সুদৃশ্য মোড়কে বার হয়ে আসে ফিনিশড প্রডাক্ট হিসাবে—কারখানার অন্যতম ডাইরেকটরও তেমনি মিনিট পনেরোর মধ্যে দাড়ি কামিয়ে, স্নানাদি সেরে সুদৃশ্য মোড়কে আপাদমস্তক মুড়ে এসে বসলেন ড্রয়িং রুমের শো-কেসে। বাথরুমেই নন্দ ইতিমধ্যে রেখে এসেছিল মীটিঙে যাবার পোশাক—খদ্দরের পাঞ্জাবি, খদ্দরের ধুতি আর বিদ্যাসাগরী চটি। কি জানি কেন সাদা খদ্দরের টুপিটি আর আজকাল ব্যবহার করেন না উনি।

সারাদিনের মতো তৈরী হয়ে এসে বসলেন বাইরের ঘরে। নন্দ ফ্যানটা খুলে দিয়ে যায়। টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে হ্যাণ্ডলুমের শান্তিনিকেতনী কাজকরা হ্যাণ্ডব্যাগটা। ওর গর্ভে আছে তাঁর ডায়েরি, কলম, চেকবই, লেটারহেড-প্যাড, নোটবই আর আছে তাম্রপাত্রের আধারে গোটা চারেক বর্মা চুরুট, একটা তোয়ালে, সাবান আর কিউটিকুরা পাউডার এক কৌটো। ঘামাচিতে বড্ড ভোগেন উনি।

অল্প পরেই ননীমাধবের হিন্দুস্থানখানা এসে দাঁড়াল পোর্টিকোর নিচে। ননীমাধব এসে প্রবেশ করেন। এসেই তাড়াহুড়া শুরু করেন—অনেক দেরি হয়ে গেছে, বুঝেছ, ভয়ানক লেট করে ফেলেছ তুমি··· আরে গাড়িটা যে এখনও ফেরত পাও নি তা আমাকে বল নি কেন? —তারপর হঠাৎ চোখ দুটো ছোট করে কণ্ঠস্বর নিচু করে রসিকতার ভঙ্গিতে বলেন—ওটার আশা ত্যাগ করো ভাই, বুঝলে দেশের সেবায় তো অনেক কিছুই দান করেছ তুমি—মনে করো ওটাও গেছে ঐ

খাতে। আর একখানা গাড়ি কেনো তুমি।

পরমানন্দের গাড়িটা আজ মাসাবধিকাল আছে তারিণীবাবুর হেপাজতে। তারিণীবাবু এ জেলায় প্রায় সকলেরই তারিণীদা। বৃদ্ধ মানুষ—আজীবন কুমার; জেলার নামকরা জননেতা। বহুবার জেল খেটেছেন—বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন জীবনে। চেষ্টা নয়··শুধুমাত্র ইচ্ছা করলেই একটা দামী গাড়ির শুধু দাম নয় বনেটের সামনে পতাকাওয়ালা গাড়িই হয়তো তিনি জোগাড় করতে পারতেন সরকার থেকে—কিন্তু তা তিনি কে া নি। এই নিরলস অক্লান্ত দেশকর্মীটি আজও আঁকড়ে আছেন রাজনীতিকেই। ইতিহাসে চিরকাল একশ্রেণীর ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকেন যাঁরা রাজ্যচালনা করেন না কিন্তু রাজাদের চালান—তাঁদের বলে 'কিং-মেকার'। তারিণীদা এ জেলার সেই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় জননায়ক। জনসেবার কাজে তাঁকে জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে উদয়াস্ত ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয়। আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে ছোটাছুটিটা বেড়ে গেছে তাঁর। পরমানন্দ একই রাজনৈতিক দলভুক্ত। তাই নিজের গাড়িটা দিয়ে রেখেছেন তাঁর তারিণীদাকে। প্রতিদানে, না প্রতিদানে কিছুই চান নি তিনি।

পরমানন্দ ধীরে ধীরে বলেন—নীলা কাল রাত্রে চলে গেছে।

ব্যস্তবাগীশ ননীমাধব বলেন—ও। তা আর দেরি করছ কেন? ওঠো, চলো যাই।

পরমানন্দ আবার উচ্চারণ করেন কথাগুলি—আমার কথাটা তুমি কানে তোল নি ননীমাধব। নীলা কাল রাত্রে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

এবার অর্থগ্রহণ হয় ননীমাধবের। বসে পড়েন একটা সোফায়: ত্যাগ করে চলে গেছে? মানে?

—মানে, আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে আমরা অন্যায় করলে ত্যাজ্যপুত্র হতাম; এখন যুগ পালটে গেছে। এখন বাপ অন্যায় করছে মনে করলে ছেলেমেয়েরা তাদের ত্যাজ্যপিতা করে।

ননীমাধব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন; তারপর বলেন—এ রকমটা

যে একদিন ঘটবেই তা আমি জানতাম। তোমাকে কতবার সাবধান করেছি আমি—অত আশকারা দিও না। তুমি কান দাও নি।… যাই হোক, ও জন্যে ভাবনা কোরো না। রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। যাবে আর কোথায়? কোনও বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে উঠেছে বোধহয়।

—না! আমার মনে হয় সে গিয়ে উঠেছে পি নাইন ব্যারাকে।

চমকে ওঠেন ননীমাধব না, না, এতটা নিচে নামতে পারে না কখনও নীলা।

—তুমি 'উদয়ের পথে' সিনেমাটা দেখেছিলে?

—না। কেন?

—ওরা একে নিচে নামা বলে না বলে, ওপরে ওঠা।

—না, না, কি আবোল-তাবোল বকছ যা তা। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। এ বাড়ির মেয়ে কখনও আমাদের কুলি-ব্যারাকে গিয়ে উঠতে পারে? যাক, এ নিয়ে অবহেলা করাটা ঠিক নয়। মীটিঙ সেরেই সোজা চলে যাব জীবনবাবুর ওখানে। সেখান থেকে তারিণীদার বাসায় কাজ সেরেই দুপুরে একটু ফুরসত পাব। তখন খোঁজ করা যাবে। বাড়াবাড়ি হবার আগেই মিটিয়ে ফেলতে হবে ব্যাপারটা। ওঠো এখন। আটটা পঁচিশ হয়ে গেছে।

ননীমাধবের সঙ্গে পরমানন্দও এসে ওঠেন গাড়িতে।

হিন্দুস্থানখানা চলতে থাকে পীচঢালা পথে—পদাতিকদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে।

আবার চিন্তার মধ্যে অবগাহন করতে থাকেন পরমানন্দ। ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা ভাবছিলেন তিনি। কোথায় যেন চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল? ঠিক মনে আসছে না। জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে বড় অতর্কিতে। এগুলি মাহেন্দ্রক্ষণ। যেমন করে বাঁক নিচ্ছে গাড়িটা জীবনপথও এমনি হঠাৎ বাঁক নেয় এমন লগ্নে। সে রকম দুর্লভ মুহূর্ত বহুবার এসেছে তাঁর জীবনে। এই তো মাস কয়েক আগে

একটা চরম মুহূর্ত এসেছিল এই পথেই। সেদিনও এমনি জোরে ছুটছিল গাড়ি। তিনি ছিলেন ড্রাইভারের পাশের সীটে, পিছনের সীটে, বসেছিল নীলা। হঠাৎ ফ্যাকটরির গেটের কাছে তাঁর মোটরের গতিপথের মাঝখানে এসে দাঁড়াল একটা লোক। ড্রাইভার অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ব্রেক না কষলে হয়তো চাপা পড়ত লোকটা। নীল পায়জামা পরা একজন কারখানার মজুর, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাফশার্টের গায়ে মবিলের মানচিত্র। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়তেই গেট থেকে ছুটে এসেছিল গুর্খা দারোয়ান—ধরেছিল লোকটাকে। পরমানন্দও মুখ বার করে ধমক দিতে যান—দেখতে পাও না! চাপা পড়ে মরতে যে!

—এ ছাড়া তো আপনার সঙ্গে দেখা করার উপায় ছিল না।

লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন পরমানন্দ। মুহূর্তে মাথাটা টেনে নিয়ে ড্রাইভারকে বলেন—চালাও!

গাড়ি কিন্তু চালানো যায় নি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে গাড়িটাকে। সকলেই কারখানার মেহনতী মানুষ। যাদের ভালো করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গ্রহণ করেছেন কোম্পানির পরিচালন-দায়িত্ব। হাফপ্যান্ট আর লুব্রিক্যান্ট-লাঞ্ছিত হাফশার্টের মিছিল।

লোকটা কাছে এগিয়ে এসে বলে—আপনাকে এভাবে আটকাতে হল বলে দুঃখিত। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল—কারখানায় আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আপনার বাড়ির দরজা থেকে তিন দিন ফিরে এসেছি। কাজেই পথের মাঝখানে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করছি।

—এখন আমার সময় নেই। পরে দেখা কোরো। ড্রাইভার!

—কবে, কখন, কোথায় বলে যান।

লোকটাকে এড়াবার জন্য উসখুস করছিলেন পরমানন্দ। কি বলবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না।

পিছনের সীট থেকে নীলা বলে ওঠে—ও কে বাবা ?

পরমানন্দ সে কথার জবাব না দিয়ে লোকটাকে বলেন -কাল সকাল দশটায় অফিসে দেখা কোরো।

ওরা তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে দেয়। গাড়ি চলতে শুরু করে।

নীলা কিন্তু একই প্রশ্ন করে আবার—লোকটা কে বাবা ?

—কি জানি ! কারখানারই কোনও মজুর হবে বোধ হয়।

নীলা চুপ করে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে একটা পরমানন্দের।

তিনি কিন্তু ভুল করেছিলেন।

নীলা চিনতে পেরেছিল ঐ লোকটাকে। কাল রাত্রে সে কথা জানতে পারেন পরমানন্দ। মনে পড়ে যায় গতকাল রাত্রে নীলার সঙ্গে উষ্ণ বাক্যবিনিময়—

—মিথ্যা কথা আমি বলি না নীলা।

—আগে বলতে না। কিন্তু · কিছু মনে কোরো না বাবা, কয়েক মাস আগে কারখানার গেটে যে লোকটি আমাদের গাড়ি আটক করে তাকে কি তুমি সত্যিই চিনতে পার নি সেদিন ?

গাড়ি এসে দাঁড়ায় কারখানার গেটে। গেট খুলে দেয় গুর্খা দারোয়ান। লোহার মোটা মোটা গরাদ দেওয়া বিরাটকায় গেট যেন লৌহকারার প্রবেশপথ - গায়ে তার কাঁটাতারের নামাবলী। মুখব্যাদান করে অনায়াসে গিলে ফেলে কালো রঙের হিন্দুস্থানটাকে। মুখ বন্ধ করে আবার। সশস্ত্র প্রহরা বসেছে গেটের পাশে। লক-আউট চলছে কারখানায়।

ওঁদের গাড়িটা অ্যাসফাল্টের সড়ক বেয়ে এসে দাঁড়ায় গাড়ি-বারান্দার নিচে।

বোর্ড-অফ-ডাইরেকটর্সদের জরুরী মীটিঙ। কলকাতা থেকে এসেছেন অন্যান্য ডাইরেকটররা। অধিকাংশই উত্তর-ভারতের লোক। ওঁদের মধ্যে একমাত্র বাঙালী কর্ণধার পরমানন্দ। ননীমাধব বর্তমানে

ম্যানেজারের পদে উন্নীত হয়েছেন। বার্টন অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা শ্বেতাঙ্গ অধিপতিরা এখন ইতিহাসের মহানেপথ্যে সরে গেছেন। ভারতীয় ধনপতিরা এসে অধিকার করেছেন ওঁদের শূন্য আসন। রাস্তা আর পার্কের নাম বদল করলেও ইংরাজ কোম্পানির নাম সচরাচর বদলাতে ইচ্ছুক হন না ভারতীয় ব্যবসাদারেরা। হাজার হোক, বিলাতী নামটারও একটা মোহ আছে। অনেক কিছু বদলে গেছে কোম্পানির। অনেক পুরনো লোক বাতিল হয়ে গেছে—এসেছে নতুন লোক। শিথিলতর হয়েছে শাসনব্যবস্থা, কারখানায় প্রস্তুত জিনিসেরও হয়েছে অবনতি—যদিচ সেটা স্বীকার করেন না ওঁরা। সে আমলের যে কয়জন মুষ্টিমেয় লোক আছেন ননীমাধব তাঁদের মধ্যে একজন। বেতনভুক পর্যায়ে বস্তুত সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত। দীপকও ঢুকেছে এ কারখানায় সেও একজন ছোটসাহেব। এঁদের সঙ্গে পরমানন্দের যথেষ্ট হৃদ্যতা, ঘনিষ্ঠতা। বস্তুত ননীমাধবের সঙ্গে পরমানন্দ একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন—কারখানায় এমন গুজবও রটেছে। এ ক্ষেত্রে পরমানন্দকেও সহজে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পান না। না হলে নিজ অংশের শেয়ারগুলি বিক্রয় করে দিয়ে বহু পূর্বেই সরে আসতে হত চৌধুরী ডাক্তারকে।

পরমানন্দের সঙ্গে কোম্পানি আজ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এর সূত্রপাত হয়েছিল যেদিন বার্টন অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানির ছোট তরফের ওয়ালটন হ্যারিস সাহেব মনস্থির করেন বাকি জীবনটা তাঁর ডিভনশায়ারের বাড়িতেই কাটাবেন। ওয়ালটন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন ডাক্তার চৌধুরীর কাছে। বস্তুত চৌধুরী ছিলেন তাঁর জীবনদাতা। প্রতিদানে ওয়ালটন সাহেব স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে প্রায় নামমাত্র মূল্যে দিয়ে গিয়েছিলেন শেয়ারের একটা গোছা। ওয়ালটনের স্ত্রী ছিলেন মিস গ্রেগামের বান্ধবী। ফলে চিকিৎসার জন্য কোনও ফী গ্রহণ করেন নি চৌধুরী। নিতে হল তাই শেয়ারের বাণ্ডিলটা। সৌভাগ্যের নবতম সূচনার এই হল আদি ইতিহাস। প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি—এবপর তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে

পড়ল ক্রমশ জেলার বাইরেও—বড় ডাক্তার বলে নয়—বড় ব্যবসায়ী বলে।

যে প্রতিষ্ঠানটিকে এতদিন তিল তিল করে গড়ে তুলছিলেন রক্তের বিনিময়ে—সেই হাসপাতাল, সেই সেবায়তন, তার ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি সবকিছু তিনি বিক্রি করে দিলেন কোম্পানিকে। নগদ টাকা অবশ্য পেলেন না—হাতে এল আর এক গোছা শেয়ার। এটা প্রয়োজন ছিল—না হলে ডিরেকটর হতে পারছিলেন না তিনি। নীলা আপত্তি করেছিল—বোকা মেয়েটা ভেবেছিল বুঝি কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সিই তাঁর লক্ষ্য—বুঝি অর্থোপার্জনের মোহে তিনি হাসপাতাল বিক্রি করে বেশী লাভজনক কারবারে বিনিয়োগ করতে চাইছেন তাঁর সম্পত্তি। সে বোঝে নি এর পিছনেও আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা। তিনি ছেড়ে দিলেন বলে তো আর হাসপাতাল উঠে গেল না; কিন্তু তিনি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন বলেই এতগুলি মেহনতী মানুষের ভালো করবার ক্ষমতা পেলেন তিনি।

ননীমাধব আর পরমানন্দ যখন এসে পৌঁছলেন তখন অন্যান্য সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। সৌজন্য বিনিময় হল—কিন্তু আন্তরিক আবেগ নেই সে কুশলপ্রশ্নের আদানপ্রদানে। সকলেরই মুখ গম্ভীর। শ্রমিকেরা ধর্মঘট ঘোষণা করেছে; লক-আউট চলেছে কারখানায়।

চতুষ্কোণ টেবিলের চারিদিকে ওঁরা ঘিরে বসেছেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এ কারখানার ইতিহাসে এজাতীয় ঘটনা অভূতপূর্ব। মফঃস্বলের এ অঞ্চলে এতদিন এ-সব হাঙ্গামা ছিল না; তা ছাড়া ননীমাধবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এ বিষয়ে। বিদ্রোহের কোনও শিশুতরু মাথা তুলছে দেখলেই যথোচিত ব্যবস্থা করতেন তিনি।

যৌবনে একমাথা ঘন কালো চুল ছিল ননীমাধবের। তা নিয়ে রীতিমত গর্ব ছিল ওঁর। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই কানের পাশে দু-এক গাছা করে পাকতে শুরু করল। রায়মশাই তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়েছিলেন। পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে নাতি-নাতিনী সুবাদ বাধিয়ে লাগিয়ে দিলেন

বালখিল্য বাহিনীকে। কাঁচা চুলের অরণ্য থেকে বেছে বেছে তামাটে রঙের চুলগুলোকে একটি একটি করে সমূলে উৎপাটিত করত ওরা। বিনিময়ে ঘুষ জোগাতে হত ননীমাধবকে--কখনও লজেন্স, কখনও তাম্রখণ্ড, কখনও বা সিনেমা দেখানোর প্রতিশ্রুতি।

কারখানাতেও একই পদ্ধতি চালিয়ে এসেছেন তিনি। নিকষ কালো সরল মানুষগুলোর মধ্যে এক-আধটা লোকের গায়ে যদি দেখা যেত তামাটে অথবা লালচে রঙের আমেজ অমনি সোন্না দিয়ে চেপে ধরতেন তাকে। সমূলে উৎপাটিত করতেন লালের আমেজ-মাখানো মানুষটিকে। এ জন্যও নতুন ধরনের লজেন্স জোগান দিতে হত এক শ্রেণীর লোককে।

কিন্তু ননীমাধবের এত সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টির মধ্যেই গোপনে এসে শিকড় গাড়ল কোন অলক্ষ্য ফাটলে এক শিশু-মহীরুহ। অনতি-বিলম্বেই নজর পড়ল ম্যানেজারবাবুর— তামাটে নয়, লোকটির রঙ রক্তের মতো লাল! বিষবৃক্ষকে সমূলে তুলে ফেলার ব্যবস্থা হল। হয়তো কঠিন হত এই অবাঞ্ছিত শ্রমিকনেতাকে ছাঁটাই করা, কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে লোকটা ছিল চোর। ওর সেকশনে কতকগুলো যন্ত্রের পার্টস চুরি গেল আর হাতনাতে ধরাও পড়ে গেল লোকটি। রেজিস্টার থেকে নাম কাটা গেল—নোটিশ দেওয়া হল কুলি-ব্যারাকের ঘর ছেড়ে দেওয়ার। ননীমাধব আশা করেছিলেন—ঐ লোকটাকে কারখানার এলাকা থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারলে মজদুর-মহলের ধূমায়িত অশান্তির বহ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে আসবে। ভুল ভেবেছিলেন উনি। ওকে চুরির অভিযোগে বরখাস্ত করার পর উলটো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল শ্রমিক মহলে। এত অল্প দিনের মধ্যেই লোকটা যে কুলি বস্তিতে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা আন্দাজ করতে পারেননি ওঁরা। লোকগুলো যেন খেপে গেল মুহূর্তে। রাতারাতি মীটিঙ করল ওরা, তৈরী করল একটি লম্বা ফিরিস্তি। তাদের প্রথম ও প্রধান দাবি হল বরখাস্ত মজুরটিকে কাজে পুনর্বহাল করা এবং অন্তবর্তী দাবি, ইউনিয়নের স্বীকৃতি— আর শেষ দাবি যে কোথায় গিয়ে থামবে তা আজ ওঁদের আন্দাজেরও

বাইরে। অল্পেই ঘোলাটে হয়ে উঠল ব্যাপারটা। দোষ দুপক্ষেরই আছে। এঁরা ধর্মঘটের আশঙ্কা করে কয়েকজনকে সামান্য অজুহাতে সাসপেণ্ড করলেন—ওরাও বিনা-নোটিশে অনুপস্থিত হল কাজে। ফলে অচিরেই ঘোলাটে হয়ে উঠল পরিস্থিতি। বর্তমানে এসে ঠেকেছে এ পক্ষের ধর্মঘটে আর ও পক্ষের লক-আউট ঘোষণায়। পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে আজ ওঁরা মিলিত হয়েছেন এই জরুরী মীটিঙে।

পরমানন্দ কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারছিলেন না। আজ যেন কি হয়েছে তাঁর। শুধু রোমন্থন করে চলেছেন অতীত ইতিহাস। গত রাত্রে নীলার সঙ্গে যে কঠিন বাক্যবিনিময় হয়েছে—বস্তুত বাদানুবাদ হয়েছে তার কথাই মনে পড়ছে বারবার। কোন আকাশস্পর্শী স্পর্ধায় সেই একফোঁটা মেয়েটা তাঁর মুখের উপর বলে গেল—তিনি আদর্শচ্যুত। তিনি ব্রাত্য।

আদর্শ! ঐ ছোট্ট কথাটির জন্য নির্যাতন তো তিনি কম ভোগ করেন নি। আর শুধু তিনি কি একা? চৌধুরী পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ। যুগে যুগে আদর্শগত পার্থক্যে একই গৃহের অভ্যন্তরে রচিত হয়েছে ভিন্নমতাবলম্বী শিবির। পিতার সঙ্গে পুত্রের, পুত্রের সঙ্গে কন্যার, পুত্রকন্যার সঙ্গে তাদের মাতামহীর নীতিগত পার্থক্যের জন্য সংঘাত বেধেছে। কিন্তু কই, কেউ তো কখনও এমন নির্লজ্জভাবে অপরকে আক্রমণ করেন নি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করেছেন। আদর্শগত বিরোধের চরমতম আঘাত সহ্য করেছে অসীম, করেছেন তিনি—তবু অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের দুজনেই। রাজনীতির উর্ধ্বে মানুষে মানুষে যে আত্মিক বন্ধন তা অবিকৃতই ছিল। আজ তা হলে সেই পারিবারিক ইমারতের ভিত্তিমূলে এমন ফাটল আত্মপ্রকাশ করছে কেন? রাজনৈতিক মতের পার্থক্যে একজন কেন অপরজনের সান্নিধ্য অসহ্য বোধ করছে?

বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সদের মীটিঙে ওদিকে আলোচনা চলেছে ঘোরালো হয়ে। একপক্ষ চাইছেন ধর্মঘটের প্রথমাবস্থাতেই ওদের

ডেকে এনে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে—অপর পক্ষ চাইছেন কঠোর হস্তে ওদের দমন করতে—যাতে কোনদিন আর মাথা তুলতে না পারে। পরমানন্দের কিন্তু এ-সব কথায় কান নেই। তিনি ডুবে আছেন অতীত জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলিতেই।

ওঁর মনের পর্দার উপর তখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে একটি শারদ প্রভাত। যে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর, সেই সর্বনেশে রাজনীতিই চুপি চুপি এসে আশ্রয় নিয়েছিল সেই শরৎরাত্রির শেষপ্রহরে। বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসবার আগেই ওঁর বাবা-মা গত হয়েছেন। বিদেশী মেয়েকে বিবাহ করায় আত্মীয়স্বজনও সম্পর্ক রাখেন নি তার সঙ্গে। ভালোই হয়েছিল একপক্ষে; কৈশোরের এবং প্রথম যৌবনের ইতিবৃত্ত লোক-চক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না। পরমানন্দের জীবন গতি পরিবর্তন করল আবার।

সেদিনও উঠেছিল প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়। বিশাল বনস্পতিকে ধরে যেমন করে ঝাঁকানি দেয় হঠাৎ-আসা কালবৈশাখী তেমনি করেই নাড়া দিয়েছিল তাঁকে. কিন্তু না, সেদিন তিনি পরাজিত হন নি। সমূলে উৎপাটিত করতে পারে নি মহীরুহকে। নিষ্ঠুর বাতাসের তাড়নে নিঃশেষিত হয়েছিল অরণ্যঅধিপতির সবুজ পাতার সম্ভার—ছিন্ন হয়েছিল কচি কিশলয়; কিন্তু রিক্তপত্র শাখার আন্দোলনে বিদ্রোহী বনস্পতি প্রতিবাদ জানিয়েছিল তবুও। তারপর নামল বজ্র। লুটিয়ে তিনি পড়েন নি—কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল উদ্ধতশির পাদপ।

বিস্মৃতির কুয়াশা কেটে গিয়ে সেই ঘটনাগুলি মনে পড়ছে আজকে। অক্টোবর মাস। বেয়াল্লিশ সালের কথা। নীলাকে যেদিন খদ্দরে মণ্ডিত অবস্থায় প্রাতরাশের টেবিলে প্রথম দেখা গিয়েছিল তারই মাসখানেক পরের কথা। সন্ধ্যা থেকে অকাল-বর্ষণ চলেছে। সারাটা রাত মেঘলা করে রয়েছে—টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে মাঝে

মাঝে। সমস্ত রাত্রি ভালো ঘুম হয় নি। আগের দিন অসীমের আচরণে বিরক্ত বোধ করেছেন তিনি। অসীম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বাড়ির শাসনশৃঙ্খলাকে সে মেনে চলছে না। কাল থেকে ছেলেটা বাড়ি ফেরে নি। কে জানে কোথায় রাত কাটাচ্ছে হতভাগা ছেলে! ইটালিয়ান কম্বলটার উত্তাপও সহ্য হচ্ছিল না। বিনিদ্র রজনীর গ্লানিতে ভারাক্রান্ত মনে অবসন্ন দেহটা নিয়ে অতি প্রত্যুষেই তিনি শয্যাত্যাগ করেছিলেন। পুবের বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় এসে বসেন। ধরান একটা সিগার। হঠাৎ মনে হল নিচে জবাগাছটার তলায় নীলা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। চমকে ওঠেন উনি। তখনও ভালো করে ফরসা হয় নি পুব আকাশটা। অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে নূতন দিন—তার রাঙা লিপির আমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে-বাতাসে। সেই রাঙা রেখার আলিম্পন আঁকা হয়েছে যেন তাঁর কিশোরী কন্যাটির মুখেও। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি অপরিচিত তরুণ যুবক। সর্বাঙ্গ কালো একটা কম্বলে ঢাকা। বছর বাইশ বয়স হবে। নীলার হাতে একটা ফুলের সাজি। রোজই এ সময়ে সে ফুল তুলতে ওঠে। মিস গ্রেহাম আর মিসেস অ্যানী চৌধুরীর প্রভাবটা তার উপর কার্যকরী হয় নি। স্কুলের দিদিমণিদের কাছ থেকেই সে অনুপ্রেরণা পেয়েছে বেশী। ঠাকুর-দেবতা-বার-ব্রতে তার অগাধ বিশ্বাস। সাধনার পথে সে খিচুড়িমার্গী। তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও তার তৃপ্তি হয় নি—দিদিমার কাছ থেকে আরও অনেকগুলি দেবদেবীর হদিস পেয়েছে সে—মেরীমাতা, যিসাস্, সেণ্ট জন, মায় মোসেস, জ্যাকব, সলোমন পর্যন্ত! ফলে চাল-ভোলা মঙ্গলবারে ডিনার টেবিলে তাকে ডাকলে সে মনে মনে শিউরে ওঠে—পাপ-স্খালনের জন্য বুকে আঁকে ক্রুশচিহ্ন। এ-সব অভ্যাস অবশ্য তার কমে এসেছে—বড় হওয়ার পর। এই অক্টোবরের ভোরবেলাতেই তার স্নান সারা হয়েছে, পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে ভিজে চুল। পূজার ফুল তুলছে অ্যারিঅ্যাডনি-তনয়া নীলা। হাসি আসে চৌধুরীর।

শুধু সন্তান নয়—কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা পরমানন্দের

প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অপরের আচরণ সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহল ছিল না তাঁর। সেদিন কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করতে পারেন নি। নীলা কি বিপ্লবী দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখছে? না হলে এই বাঘের বিবরে কোন সাহসে মাথা গলায় ঐ ছোকরা অকুতোভয়ে? এ দুর্জয় সাহস কি করে সংগ্রহ করল লোকটা? চকিতে মনে হয় পরমানন্দের —ঐ লোকটার আগমনের দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় ঐ ছেলেটি বিপ্লবী দলভুক্ত—এসেছে নীলার কাছে তার প্রশ্রয় পেয়েই। অথবা ওদের সাক্ষাৎকারের পিছনে আছে কোনও বিদেহী দেবতার ইঙ্গিত। যৌবনের অন্য এক আকর্ষণের উন্মাদনায় ও এসে দাঁড়িয়েছে নীলার অত কাছে। এ ছাড়া তার ঐ গোপন আবির্ভাবের আর কোনও কারণ থাকতে পারে না। উৎকর্ণ হয়ে তিনি ওদের কথোপকথনে মনোনিবেশ করেন।

নীলা বলছিল, এ সময়ে বাবা রুগী দেখেন না। আপনি এভাবে এসেছেন কেন?

না! ছেলেটিকে নীলা তাহলে চেনে না। কোনও অতনু দেবতার অনুপ্রেরণায় ওরা এখানে মিলিত হয় নি। তবে কেন এসেছে ও?

নীলা তখন বলছিল, আটটার পর তাঁর চেম্বারে আসবেন। ঐ ঘরটায়।—হাত বাড়িয়ে সে বাইরের দিকের নার্সিং হোমটা দেখিয়ে দেয়।

—আটটা? আটটা পর্যন্ত বাঁচব তো? দেখুন, আপনি একবার দয়া করে ওঁকে গিয়ে বলুন যে, বিশেষ কারণে তাঁর চেম্বারে আসা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। উপায় থাকলে আটটা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতাম, কিন্তু—

বাধা দিয়ে নীলা বলেছিল—সারারাত বাবার ঘুম হয় নি। তাঁকে এ সময়ে আমি জ্বালাতন করতে পারব না।

—জ্বালাতন! না বিরক্ত তিনি কখনও হবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন। বহুদূর থেকে আসছি আমি তাঁর সন্ধানে। আপনি আপনার বাবাকে যতটা চেনেন তার চেয়ে অনেক বেশী আমি চিনি তাঁকে। আপনি একবার দয়া করে তাঁকে খবর দিন।

কে ঐ ছেলেটা? পরমানন্দ পিছনের স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে বাগানে নেমে আসেন।

নীলা বিরক্ত হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে তর্ক করার আমার সময় নেই।

ছেলেটি হেসেছিল। না, অস্ফুট আলোয় হাসিটা তিনি স্পষ্ট দেখতে পান নি। তবু অনুমান করতে পারেন, বিচিত্র একটা হাসি হেসে ও বলেছিল, আশ্চর্য! পুণ্যের লোভে এই দুরন্ত শীতে স্নান সেরে পূজার ফুল তুলতে এসেছেন—ডাক্তার পরমানন্দের কন্যা আপনি—অথচ অদৃষ্টের কী বিড়ম্বনা, একটা হতভাগ্য মুমূর্ষু মানুষের প্রাণদানের পুণ্যটাও আপনি অনায়াসে প্রত্যাখান করছেন—

এর পর আর তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। ছেলেটার সামনে এসে বলেছিলেন—কি চাও?

চমকে উঠেছিল নীলা।

ছেলেটি আপাদমস্তক তাঁকে দেখতে থাকে। বলে, আপনিই?

—হ্যাঁ, ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরী, যাকে তুমি আমার মেয়ের চেয়েও ভালো করে চেন। বলো, কি চাও তুমি।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছেলেটি বলে—ভিতরে চলুন, বলছি।

ওর পতনোন্মুখ দেহটা বাপে আর মেয়েতে ধরাধরি করে নিয়ে আসে ড্রইংরুমে। বসিয়ে দেয় একটা গদিআঁটা সোফায়।

চৌধুরী বলেন, এবার বলো, কেন এসেছে তুমি আমার কাছে।

ছেলেটি ইতস্তত করে বলে, আপনাকে নিভৃতে বলতে চাই।

—এখানে নিভৃতই আছ তুমি—বলো।

ও চুপ করে থাকে। হঠাৎ উঠে পড়ে নীলা। ত্বরিতবেগে চলে যায় ঘর ছেড়ে। ছেলেটি ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। তারপর হঠাৎ আত্ম-সচেতন হয়ে ফিরে তাকায় ডাক্তার চৌধুরীর দিকে। আস্তে আস্তে কম্বলটা উঁচু করে বাঁধন খুলে দেখায় দক্ষিণ জানুর ক্ষতচিহ্নটা। ভ্রূকুঞ্চিত

হয় চৌধুরী ডাক্তারের। ক্ষতচিহ্নটার জাত আন্দাজ করেন মুহূর্তমধ্যে। ছেলেটি কিন্তু কোনও ইতস্তত করে না আর। স্পষ্টই স্বীকার করে অকুতোভয়ে, গুলিটা আপনি বার করে দিন ডাক্তারবাবু। পালাতে হয়তো পারব না, তবু আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্রটাও যখন হাতছাড়া হয়ে গেল তখন একজোড়া সুস্থ সবল পা-ও কি পাব না আমি? আপনার মতো সার্জেন দেশে থাকতে?

ওর দুর্জয় সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন পরমানন্দ। বলেন, কি করে এমন হল?

এত যন্ত্রণার মধ্যেও ছেলেটি হাসল। বললে আপনাকে বলব না যে গেম বার্ডস শিকার করতে গিয়ে ভুল করে লেগেছে। অথবা ডাকাত ধরতে গিয়ে।

—তোমার নাম কি? আসছ কোথা থেকে?

একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—এ প্রশ্নটা করা কি উচিত হচ্ছে আপনার?

—নিশ্চয়! রুগীর নাম ধাম না জেনে, কেস-হিসট্রি না জেনে তো রুগীর দায়িত্ব নিতে পারি না আমি।

এক মিনিট দুজনেই নীরব। তারপর ছেলেটি আবার বলে—আমি জানি আপনার বিপদের কথা। আপনার দায়িত্বের কথা। অপারেশন হয়ে গেলে একটা রাতও থাকব না আমি এখানে। আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে শহরের প্রান্তে। সেখান থেকে আমি একা এসেছি। ওরা আমার জন্য দু দিন অপেক্ষা করবে—তার ভিতর ফিরে না গেলে ওরা ধরে নেবে যে আমি হয় ধরা পড়েছি নয় মারা গেছি। আপনি একটা দিন শুধু আমাকে আশ্রয় দিন। গুলিটা বার করে দিলেই আমি ফিরে যাব ওদের কাছে—এ জন্মে কেউ কোনদিন জানতেও পারবে না, কে বার করে দিল বুলেটটা।

ড্রইংরুমে বড় ওয়ালক্লকের পেণ্ডুলামটার একাধিপত্য পরবর্তী নীরব কয়েকটি মুহূর্তের নৈঃশব্দ্যের উপর। পরমানন্দ তারপর বলেছিলেন—তা আমি পারি না। আমি তোমার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক নই।

আমার সন্তান আছে, সংসার আছে। তোমাকে ধরিয়ে আমি দেব না। কিন্তু আশ্রয়ও দিতে পারব না। এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও আমার বাড়ি থেকে।

ছেলেটি স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওর মুখভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, এটা সে একেবারেই আশঙ্কা করে নি। বলেও সে কথা—এটা যে হতে পারে তা তো ভাবি নি। ভেবেছিলাম কোনক্রমে আপনার এখানে এসে পৌঁছতে পারলেই আমার মুক্তি।

—কিন্তু এটাই তো আশঙ্কা করা উচিত ছিল তোমার। আমার পরিচয় তো শহরসুদ্ধ লোকের অজানা নেই। আমি বিলাত-ফেরত, বিলাতী কেতার মানুষ। মেম বিয়ে করেছি—আগামী বারে রায়বাহাদুর হব আমি—শোন নি? তোমার বরং ভাবা উচিত ছিল, আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব!

মাস কয়েক আগে ঐ বয়সেরই আর একটি উদ্ধত যুবকের একটা একটা বাঁকা ইঙ্গিতের জবাব দিলেন নাকি ডাক্তার চৌধুরী?

ছেলেটি শান্তস্বরে শুধু বলে—শহরসুদ্ধ লোক আপনার যে পরিচয় জানে—আমি তার কিছু বেশী জানি। না হলে সেই মহিষাদল থেকে এতদূর আসতাম না আপনার খোঁজে।

—কোন মহিষাদল? মেদিনীপুর মহিষাদল?—তারপরই হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠেন—না না, আর কোনও কথা নয়। তোমার পরিচয় দিয়ে আমার কি প্রয়োজন? তুমি চলে যাও!

—যাব তো বটেই—তাড়িয়ে দিলে যেতে তো হবেই; কিন্তু একটা কৌতূহল চরিতার্থ না করে তো নেতে পারছি না ডাক্তারবাবু। আমি ভুল ঠিকানায় আসি নি তো? যেখান থেকে আজ আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটাই কি ডাক্তার পরশুরাম চৌধুরীর বাড়ি?

পরমানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ নাম কী করে জানল ও ছোকরা? দুরন্ত কৌতূহল হয় জানতে—কোন সূত্রে ঐ নামটা সংগ্রহ করেছে ছেলেটা। পরশুরাম যে তাঁরই একটা নাম—এটা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। শতাব্দীর একপাদকাল কেউ ও নামে ডাকে নি

তাঁকে। যে-সব খাতাপত্র, চিঠি অথবা ডায়রিতে ঐ নামের উল্লেখ ছিল তা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে বিশ-পঁচিশ বছর আগে। সে যুগে তাঁর ঐ নামটা জানত মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। আর তাদের অধিকাংশই আবার জানত না তাঁর আসল নাম। কিন্তু না, এ কৌতূহল চরিতার্থ করতে গেলেই ঘনিষ্ঠ হতে হবে ছেলেটির সঙ্গে, হয়তো জড়িয়ে পড়বেন আবার। আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়; আত্মসংবরণ করেন তিনি, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন, দ্বিতীয় আর একটি কথা উচ্চারণ করলে আমি থানায় খবর দিতে বাধ্য হব।

ওকে যেন সহ্য করতে পারছেন না আর। হয়তো সংযম ভেঙে পড়বে—হয়তো জড়িয়ে পড়বেন আবার। রিসিভার থেকে টেলিফোনটা তুলে নেন হাতে। ফোন করবার উদ্দেশ্যে নয়—এও একটা হুমকি। পরমানন্দ কি ভয় পেয়েছেন? না কি শুধু উত্তেজিত হয়েছেন? হাতটা কাঁপছে কেন তাঁর?

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছিল। বসে পড়ে আবার সোফায়। বলে, করুন টেলিফোন। সত্যিই আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই ডাক্তারবাবু। কী হবে এই পোড়া দেশের জন্য বেঁচে? এ দেশ আর পরশুরামের দেশ নয়। এ এখন রামরাজ্য—দেশজননী সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পরমানন্দে রাজৈশ্বর্য ভোগ করছেন—পরশুরামের কুঠারটায় ধরছে মরচে।

—তুমি যাবে কি না?

—না।

যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে সোফায় এলিয়ে দেয় ক্লান্ত দেহটা। কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে গুটি মেরে শুয়েই পড়ে একেবারে।

ও কি অনুমান করেছে পরশুরামের অন্তরের দুর্বলতা?

—তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না যে, তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি আমি?

চোখ বুজেই ও জবাব দেয়, কেন পারব না? এমন কি দুঃসাহসিক কাজ সেটা আপনার পক্ষে?

—তবে চলে যাচ্ছ না কেন?

—চলে যাবার ক্ষমতা নেই বলে—

বিচিত্র হাসি হাসে ছেলেটা। এবার সে হাসিটা স্পষ্ট দেখতে পান উনি। বলে, বাঁচতে তো এমনিতেই পারব না। এই হতভাগা ঠ্যাঙখানাকে কাঁধে করে এতটা পথ এসেছি—আবার সে পথে ফিরে যাবার আর ক্ষমতা নেই। তার চেয়ে আপনি টেলিফোন করুন ডাক্তারবাবু। তবু আপনার দেশসেবার একটা পুরস্কার দিয়ে যেতে পারব, ধরা পড়ার আগে। হাজার হোক, আপনিও তো এ হতভাগা দেশের জন্যে কম করেন নি একদিন। তবু বুঝব আমার ধরা পড়ায় পরশুরাম চৌধুরী একটা খেতাব পেলেন।

—কে পরশুরাম চৌধুরী? আমি চিনি না তাঁকে—

—একশবার! আপনি কি করে চিনবেন তাঁকে! আপনি বিলাত-ফেরত বিলাতী কেতার মানুষ—আপনি তো তাঁকে চিনবেন না! অথচ ঐ পরশুরামই একদিন বলেছিলেন, শচীশ নন্দীকে—পাঠকদার স্বপ্ন আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। বলেছিলেন, তিনি আমেরিকা থেকে জার্মানিতে যাবেন পালিয়ে। সেখনে থেকে সংগ্রহ করবেন বিপ্লবের সরঞ্জাম। পরশুরাম অবশ্য জার্মানি যান নি। তার আগেই চট্টলার পাহাড়ে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। এতদিন জানতাম জ্যোতির্ময় পাঠক আর শচীশ নন্দীই বুঝি আত্মাহুতি দিয়েছেন সে ব্যর্থ প্রচেষ্টায়;—কিন্তু না। আজ দেখছি পরশুরাম চৌধুরীও ঐ সঙ্গে স্বর্গগত হয়েছেন।

পরমানন্দ ওর কাঁধ দুটি ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বলেন—কে? কে তুমি? কি করে জনেলে এ-সব কথা?

বাবার ডায়েরিটা পুলিশের হাতে পড়ে নি। মায়ের কাছ থেকে সেটা আমি পেয়েছিলাম। তাই আমার বড় ভরসা ছিল ডাক্তারবাবু—এ শুধু আপনিই পারবেন। সেজন্যেই সেই মেদিনীপুর থেকে এত দূর ছুটে এসেছি।

—তুমি···তুমি জ্যোতির্ময়দার ছেলে?

—না? আমার বাবার নাম ৺শচীশ নন্দী। উনিশ শো ত্রিশে

চট্টগ্রামে মারা যান তিনি····

ডাক্তার চৌধুরী এ বিষয়ে কি বলেন ?

নিজের নামটা কানে যাওয়ায় যেন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠেন পরমানন্দ। হ্যাঁ, ডিরেকটর বোর্ডের মীটিঙে উপস্থিত আছেন তিনি। অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করেন। আলোচনাটা কিসের তা তিনি বিন্দুমাত্র জানেন না। একবর্ণও শোনেন নি। হঠাৎ লক্ষ্য হয় ঘর সুদ্ধ সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

পরমানন্দ গম্ভীরভাবে বলেন, আপনারা পাঁচজনে যা স্থির করবেন তাই মেনে নেব আমি।

—আমরা তো একমত হয়েছি—ভয় আপনাকেই, আপনার তো আবার নানান আদর্শের বাতিক আছে।

ম্লান হাসেন চৌধুরী সাহেব।

—দ্যাট্‌স্‌ সেট্‌ল্‌ড দেন। কাম্‌ টু দি নেক্সট আইটেম অব দি অ্যাজেণ্ডা প্লীজ।

আবার শুরু হয়ে গেল আলোচনা। ধর্মঘটী মজুরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নির্ধারণ করতে থাকেন ওঁরা।

পরমানন্দ যথারীতি ডুবে যান অতীত রোমন্থনে।

নিপুণ হস্তে অস্ত্রোপচার করেছিলেন সেদিন ডাক্তার চৌধুরী। সে কথা জানতে পেরেছিল বাড়ির তিনটি প্রাণী। পরমানন্দ গোপন করতে চেয়েছিলেন সকলের কাছ থেকেই। চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু কিশোরী আনাড়ি নীলার সহায়তায় অপারেশন করা সম্ভব হয় নি। বৈশাখীকে ডাকতে হয়েছিল ফলে। আর মিস গ্রেহামকে লুকিয়ে এ বাড়িতে কোনও কিছু করা সম্ভব ছিল না। ভালো করে সকাল হবার আগেই নিয়ে এসেছিলেন হতচেতন ছেলেটিকে ভিতর বাড়িতে। নার্সিং হোমে ওকে রাখা নিরাপদ নয়। বাড়ির ভিতরেও ওকে লুকিয়ে রাখা কঠিন। পরমানন্দ ওকে আশ্রয় দিলেন বৈশাখীর ঘরে। পশ্চিম দিকের ঘরখানা

ছেড়ে বৈশাখী এসে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিল নীলার শয়নকক্ষে।

নীলা অবাক হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। ছেলেটি যে টেররিস্ট, আগস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী, এটুকু সে আন্দাজ করেছিল অনায়াসে। তাছাড়া পরমানন্দ সে কথা তাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—সাবধান করে দিয়েছিলেন এ সংবাদটা গোপন রাখতে। মিস গ্রেহাম সমস্ত বুঝেও নীরব রইলেন। বৈশাখীকে ডেকে পরমানন্দ বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটার গুরুত্ব ও গোপনীয়তা।

কদিন ছিল ছেলেটি? দিন তিন-চার হবে বোধ হয়। ঠিক মনে নেই আজ। শুধু এইটুকু মনে আছে—অপারেশনের পরে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। সমস্ত জীবনীশক্তিটুকু সে নিঃশেষ করে এসেছিল আহত অঙ্গটাকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে পৌছনোর পথে। পরদিনই প্রতিশ্রুতি-মতো সে চলে যেতে চেয়েছিল অনুমতি দিতে পারেন নি চৌধুরী ডাক্তার।

কিন্তু কথা ছিল আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে ওরা ধরে নেবে আমি মারা গেছি অথবা ধরা পড়েছি।

—তুমি ঠিকানা বলো—আমি খবর দিয়ে আসছি।

—আপনি নিজে যাবেন সেখানে?

—কেন, বিশ্বাস করতে পারছ না আমায়?

ছেলেটি হেঁট হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিল—আমার কটু কথাগুলো আপনি ভুলতে পারেন নি দেখছি।

ওর সেবার ভার পড়েছিল নীলার উপর। বৈশাখীকে নার্সিং হোমে তার দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে নীলাকেই নিতে হল দায়িত্ব। ঘড়ির কাঁটার হিসাবে সে পথ্য আর ওষুধ পরিবেশন করে। টেম্পারেচার রাখে। নিরলস অতন্দ্র সেবায় সে পরিচর্যা করে চলে আগন্তুকের। ওদের অন্তরালের জীবনে কী কী ঘটনা ঘটেছিল জানা সম্ভব নয় পরমানন্দের পক্ষে। তবে একটা জিনিস তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। নির্জন কক্ষের গোপনীয়তায় ঐ কিশোরী নার্স আর তার রুগী পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। পরমানন্দ একটু

অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। এত অল্প সময়ে, এত সামান্য পরিচয়ে কী করে এত আকৃষ্ট হল নীলা ঐ ছেলেটির দিকে? হয়তো বীরপূজার একটা সেন্টিমেন্টই ওর মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হবার মতো একটা ক্ষেত্র পূর্বেই তৈরি করে রেখেছিল। বিপ্লবাত্মক মতবাদের প্রতি নীলার যে একটা অন্ধ আকর্ষণ জন্মেছিল তা ঠিকমতো বিকশিত হবার সুযোগ পায় নি চৌধুরীবাড়ির শৃঙ্খলায়িত বাতাবরণে। ওর দাদা, ওর বাবা, ওর দিদিমা ওকে বেঁধে রেখেছিল এতদিন। হঠাৎ ওর মনের সেই নিরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পেল এবার। ঐ বাইশ বছরের তারুণ্যের মধ্যেই সে দেখতে পেল বিপ্লবের একটা মূর্ত প্রতীক। এত কথা হয়তো তাঁর খেয়াল হত না—হল বৈশাখীর কথায়।

অপারেশনের পর তৃতীয় দিনে বৈশাখী এসে বললে কাকাবাবু, এবার ওঁকে পাঠিয়ে দিন।

কথাটার মর্ম প্রথমটা অনুধাবন করতে পারেন নি। তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কার কথা বলছ তুমি?

—অরুণাভবাবুর কথা।

—অরুণাভ? কে সে?

—ঐ যে ছেলেটি আমার ঘরে আছেন আজ কদিন।

—ও! ওর নাম বুঝি অরুণাভ? তা কেন, হঠাৎ ওকে সরিয়ে দিতে বলছ কেন? অসীম কি ফিরে এসেছে বাড়িতে?

—না, তিনি ফেরেন নি।

—অসীম কোথায় গেছে জান? হপ্তাখানেক হয়ে গেল আজ নিয়ে।

—না, এক সপ্তাহ নয়, পাঁচ দিন, ছয় রাত্রি—কোথায় গিয়েছেন জানি না।

পরমানন্দ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। এতদিন ধারণা ছিল, সেজন্য তাঁর উদ্বেগেই এ বাড়িতে সবচেয়ে বেশী—তিনি বাপ। হঠাৎ অনুভব করলেন—না, তাঁর চেয়েও অধীরতর উৎকণ্ঠায় আর একজন অপেক্ষা করছে অসীমের প্রত্যাবর্তন। তিনি দিন-সাতেক পুত্রকে না দেখে

বিচলিত হয়েছেন— কিন্তু বৈশাখী প্রতীক্ষা করছে পাঁচ দিন ও ছয় রাত্রি।

—ওঁর হাবভাব আমার ভালো ঠেকছে না—শেষকালে নীলার না সর্বনাশ করে যান।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল পরমানন্দের। কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। বিপ্লবপন্থীদের মর্মকথা তাঁর অজানা নয়। ও পথের অভিজ্ঞতা তাঁরও আছে। এই পথে যারা পা বাড়ায় তারা কখনও কোনও ছোট কাজ করে না। শচীশ নন্দীর ছেলে আর যাই করুক এত বড় উপকারের প্রতিদানে সে নীলার কোনও ক্ষতি করে যেতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের উপর এটুকু সংযম যার নেই সে কখনও এভাবে দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে? কিন্তু নীলা যে দিবারাত্রির সমস্তটা সময় ওর শয্যাপার্শ্বে লীন হয়ে আছে এটাও লক্ষ্য করেছেন তিনি। তা ছাড়া তিনি প্রতিদিন লক্ষ্য করেছেন—যখন রোগীকে পরীক্ষা করতে যান, ড্রেসিং করে দেন ক্ষতস্থানটা, তখন কি অসীম আগ্রহে নীলা জানতে চায় রোগীর উন্নতির কথা। সেটাকে নারীর কোমল স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বলেই মনে করেছিলেন এতদিন—তার বেশী কিছু নয়।

পরমানন্দ জবাবে বলেছিলেন, কিন্তু ওকে তো এখন পাঠাতে পারি না আমি। আর কিছুদিন না গেলে ও উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

—তাহলে নীলাকে সরিয়ে ওঁর সেবার ভার আমার উপরে দিন। নার্সিং হোম থেকে কদিন ছুটি দিন আমাকে।

আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল পরমানন্দের। বাড়িতে দুটি রমণী, একটি বহিরাগত তরুণ যুবক। বিদেহী দেবতা কি এই সুযোগে একটা ত্রিভুজ রচনা করে বসলেন চৌধুরীবাড়ির অন্তঃপুরে? তখনও পরমানন্দ জানতেন না, বৈশাখীর সঙ্গে অসীমের সম্পর্কটা। সেটা জেনেছিলেন অনেক পরে। সেটা প্রথম নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যেদিন ঝড়ের পরে বর্ষণক্লান্ত দুর্যোগরজনীতে নেমে এসেছিল প্রচণ্ড বজ্র তাঁর উদ্ধত শিরে।

উনি ব্যবস্থাটা অগত্যা পালটে দিলেন। নীলাকে বোঝানো হল

রোগীকে অভিজ্ঞ নার্সের হাতে রাখাই বাঞ্ছনীয়। নার্সিং হোম থেকে দিন তিনেকের ছুটি মঞ্জুর হল বৈশাখীর। সে আশ্রয় নিল তার নিজের শয়নকক্ষে—রোগীর পাশে।

পরের দিন আরও ঘোরালো হয়ে উঠল পরিস্থিতিটা। অসীম ফিরে এল পরের দিন। দিন সাতেক পরে বাড়ি ফিরেছে সে। জলে কাদায় মলিন দেহ, অস্নাত রুক্ষ চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিতে দিতে লঘুপায়ে সে এসে হাজির হল বৈশাখীর ঘরে। রক্ষাবাহিনীর কাজেই তাকে বাইরে যেতে হয়েছিল হঠাৎ। যাবার সময় বাড়িতে কোনও খবর দিয়ে যেতে পারে নি তাড়াতাড়িতে। বাবা নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন—নীলা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সেজন্য উৎকণ্ঠা নেই অসীমের। তার ভয় ছিল বৈশাখীকে। বিনা সংবাদে এ কয়দিন তার অজ্ঞাতবাসের জন্য নিশ্চয়ই মর্মান্তিক অভিমান করে আছে বৈশাখী। প্রথমেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। দুটো মিষ্টি কথায় তার অভিমানকে করতে হবে দ্রব। বৈশাখীর ঘরটা বাড়ির একান্তে, পশ্চিম কোণার পিছন দিকে। পা টিপে টিপে সকলের অলক্ষিতে অসীম এসে দাঁড়ায় ওর দ্বারের পাশে। দ্বার খোলাই ছিল। ভেজানো। টোকা না দিয়েই বৈশাখীর ঘরে ঢুকবার অধিকার ছিল অসীমের—ওদের সম্পর্কের জোরে। ওকে চমকে দেবে বলে হঠাৎ দ্বার খুলে ঘরে ঢোকে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়তে হয় চৌকাঠের উপরেই।

বৈশাখীর খাটে শুয়ে আছে একটি অপরিচিত যুবক। খাটের পাশেই বিছানায় বসে আছে বৈশাখী—যুবকটির মাথা দক্ষিণ বাহুতে আলিঙ্গন করে ধরে বাঁ হাতে ওর মুখের কাছে ধরে রেখেছে কি একটা পানীয়। আধশোওয়া লোকটা বৈশাখীর নরম বুকে মাথা হেলান দিয়ে তার হাতের গ্লাস থেকে পান করছে - পানীয়টা কি তা বোঝা গেল না। মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অসীম। ওরা দুজনেই মুখ তুলে তাকায়। বৈশাখীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

ধরা পড়ার ছাপ সে মুখে স্পষ্ট। যেটুকু সন্দেহ ছিল অসীমের—তা নিরসন হল ভয়ে-সাদা-হয়ে-যাওয়া বৈশাখীর চোখের দৃষ্টিটায়।

ছেলেটিও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে ওর আকস্মিক আবির্ভাবে।

—আয়াম সরি।—

দ্বার ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে অসীম।

পরমুহূর্তেই বের হয়ে আসে বৈশাখী : কখন এলে?

অসীম প্রতিপ্রশ্ন করে—ভাগ্যবানটি কে?

বৈশাখী কৌতুক বোধ করে ওর প্রশ্নের ধরনে। অসীমের ঈর্ষাবহ্নিতে নূতন সমিধ সরবরাহ করে : আমার একজন ফ্রেণ্ড!

—ফ্রেণ্ড! তোমার ফ্রেণ্ড! মানে?

—ফ্রেণ্ড শব্দের অর্থ জান না? তাই তো—মানে, তোমাদের অভিধান অনুযায়ী যাকে বলে কমরেড!

অসীম জ্বলে উঠেছিল এ কথায়। বলে—রসিকতা রাখো। কিন্তু এ-সব বৃন্দাবনলীলা বাড়ির বাইরে হওয়াই ভালো নয় কি? এ বাড়ির একটা স্যাংটিটি আছে। নিজের বিছানায় বয়ফ্রেণ্ডকে ডেকে আনার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু এজন্যে হোটেলে তো সস্তায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। নীলার চোখের সামনে এ বাড়তি রোজগারটুকু না করলেই নয়।

—বাড়তি রোজগার!—বৈশাখীর অস্ফুট কণ্ঠে ফুটে ওঠে ওর অবমানিত আত্মার আর্তি।

—না তো কি! নার্সদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম—কিন্তু তুমিও যে কোনও অনাত্মীয় যুবকের মাথা অমনভাবে বুকের উপর টেনে নিয়ে ঢলামি করতে পার—তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

বৈশাখী ভুলে যায়—মুহূর্তপূর্বে সে নিজেই অসীমের ঈর্ষাবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল মজা করার জন্য। কঠিন স্বরে সে বলে—ও, তাই বুঝি। এ বাড়িতে অনাত্মীয় কুমারী মেয়ের মাথা বুকে টেনে নিয়ে বৃন্দাবনলীলা করার অধিকার যে একমাত্র অসীমবাবুরই আছে তা জানা ছিল না আমার।

অসীম এক লহমা স্থির থেকে ধীর কণ্ঠে বলে : আমার ধারণা ছিল সে অধিকার তুমি আমাকে দিয়েছিলে—ভালোবেসেই—তখন

তোমার বয়ফ্রেণ্ডদের কথা জানতাম না আমি। ভুলটা ভেঙে গেছে আমার—আমার পূর্ব আচরণের জন্য তাই মাপ চাইছি।

অসীম যাবার জন্য পা বাড়ায়। হাতটা চেপে ধরে তার বৈশাখী।

—কী পাগলামি করছ! দেখছ না ও পেশেণ্ট—উঠে বসতে পারে না, তাই ওইভাবে খাইয়ে দিচ্ছিলাম ওকে।

—পেশেণ্ট! কেন, কি হয়েছে ওর?

—ওর পায়ে একটা অপারেশন করা হয়েছে।

—তা এ ঘরে কেন? নার্সিং হোমে কি বেড নেই?

—ওকে এ ঘরে এনে রেখেছেন কাকাবাবু।

—কেন?

—তা কি করে জানব—তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।

অসীম একমুহূর্ত কি ভাবে। তারপর বলে: কি হয়েছিল ওর পায়ে?

—ডাকাতের গুলি লেগেছিল!

সত্যি বলছ? আমি কিন্তু বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছিল বৈশাখী জানালার ধারে, বলে—ঐ দেখো পায়ের ব্যাণ্ডেজ।

লোকটা চোখ বুজে শুয়েছিল। অসীম চমকে ওঠে ওকে দেখে। এতক্ষণে ভালো করে লক্ষ্য করে সে বৈশাখীর পেশেণ্টকে। এ তার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে, কোথায় দেখেছে? তারপরের মুহূর্তেই মনে পড়ে গিয়েছিল—এই মুখের ফটো দেখেছে সে। চিনতে পারে লোকটাকে। বৈশাখীর হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে এসে হাজির হয় পরমানন্দের সামনে।

পিতাপুত্রের সে সাক্ষাৎটাও নাটকীয়।

—বৈশাখীর ঘরে যে ছেলেটি আছে ও কে?

চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে রেখে পরমানন্দ প্রতিপ্রশ্ন করেন—এ কদিন কোথায় ছিলে?

রক্ষীবাহিনীর কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। কতকগুলো হুলিগান

এসেছে এই এলাকায়। রেল-লাইনের ফিশ-প্লেট তুলে ফেলছে, টেলিগ্রাফের তার উপড়ে ফেলছে—তাই আমাদের ডিউটি পড়েছিল পাহারা দেওয়ার···কিন্তু আমার কথাটা আপনি শুনতে পান নি।

—শুনেছি, ও ঘরে আছে একটি পেশেণ্ট—ওর পায়ে একটা অপারেশন করেছি আমি।

—কিন্তু ও তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। ডাকাতের গুলি নয়—মহিষাদল থানা লুট কেসে ঐ ছেলেটির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

—ডাকাতের গুলি লেগেছে—এ কথা কে বলেছে তোমাকে?

—বৈশাখী।

পরমানন্দ একবার ইতস্তত করেন। অদূরে বসে নীলা একটা উলের সোয়েটার বুনছিল। ঘর পড়ে যায় তার কয়েকটা কাঁটা থেকে। মিস গ্রেহাম উলের গুলি পাকিয়ে দিচ্ছিলেন ফেটি খুলে। জড়িয়ে জট পাকিয়ে যায় বাণ্ডিলটা।

পরমানন্দ দ্বিধাসংকোচ ঝেড়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত বলেন—বৈশাখী ভুল বলেছে। ডাকাতের গুলি লাগে নি ওর।

—তুমি তাহলে সব জান?

—জানি!

—জান? তবু আশ্রয় দিয়েছ ওকে?

ধীরকণ্ঠে পরমানন্দ বলেন—তোমার রাজনীতিতে আমি কোনদিন হস্তক্ষেপ করি নি। আমার চিকিৎসা ব্যাপারেও আমি আশা করব তুমি হস্তক্ষেপ করতে আসবে না।

অসীম বলে: এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। সেদিন বুঝতে পারি নি, কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝতে পারছি কেন তুমি নীলাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে কাগজগুলো। তোমাকে উপদেশ দিতে যাবার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু তুমি কি জান যে ছেলেটিকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ সে একজন কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীকে খুন করে এসেছে? সে খুনী আসামী?

—খোকা!—থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পুত্রকে। বলেছিলেন, আমার বিচার তুমি করতে বোসো না, আমার রাজনীতি তুমি বুঝবে না।

অসীম উত্তেজিত হয়ে বলেছিল : আজ তোমাদের গান্ধীজী জেলের বাইরে থাকলে এইসব নৃশংস কাজের প্রথম প্রতিবাদ তিনিই করতেন। এদিকে জাপান ডিমাপুরে এসে পড়েছে—ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বের জনশক্তি আজ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—আর তোমরা শুধু অন্তর্ঘাতী সংগ্রামে সে জনযুদ্ধকে সাবোটাজ করছ।

মিস গ্রেহাম শুধু বলেছিলেন—প্লীজ অসীম····

অসীম কর্ণপাতও করে নি, সমান তালে বলে চলে : কতকগুলো ফন্দিবাজ এজেন্ট প্রভোকেটর মিথ্যা গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে আর তোমরা অন্ধের মতো····

—শাট আপ!—গর্জন করে উঠেছিলেন আগ্নেয়গিরির মতো পরমানন্দ : তোমার যা কর্তব্য মনে হয় তা করতে পার। কিন্তু এই অন্ধ বৃদ্ধের চোখ ফোটাবার চেষ্টা কোরো না। যাও—

—আমার এক্ষেত্রে যা কর্তব্য তা করলে তার কী পরিণাম হবে জান? সহ্য করতে পারবে তা?

অপরিসীম ধৈর্যে দ্বারের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে শুধু বলেছিলেন—যাও!

মুহূর্তখানেক অসীম দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল হয়ে তা সত্ত্বেও। তারপর বললে—বেশ যাচ্ছি! যা কর্তব্য মনে করছি তাই করব আমি।

চলে যাবার জন্য পা বাড়ায় অসীম।

পরমানন্দ আবার বলেন—দাঁড়াও! যা করতে চাও তার ফলাফল ভেবে নিয়ে কোরো। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বোসো না। এর পরিণাম সহ্য করবার শক্তি তোমার আছে কিনা ভেবে দেখো একবার।

তোমার কথাটার উপর ঝোঁক পড়ে তাঁর।

মাথা খাড়া রেখেই চলে যায় অসীম।

মিস গ্রেহাম ওকে ফিরে ডাকেন। কর্ণপাত করে না সে।

নীল হয়ে বসে থাকে নীলা।

হন হন করে স্বল্পালোকিত করিডোরটা দিয়ে অসীম চলেছিল। হঠাৎ পিছন থেকে জামায় টান পড়ে ওর। অসীম দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কোথায় চলেছ?

—অসীম আপাদমস্তক একবার দেখে নিল বৈশাখীকে। ছোপ-ছোপ জংলা রঙের একটা শাড়ি পরেছে সে। এলো করে বাঁধা ঢলকা খোঁপা ভেঙে পড়েছে কাঁধের উপর। সেই ভাঙা খোঁপাতেই গোঁজা আছে একটা আধফোটা রক্তগোলাপ। একটু আগে বৈশাখীর শয়নকক্ষে রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাখা ফুলদানিটাতে যে রক্তগোলাপের গুচ্ছ দেখে এসেছিল—তারই একটা।

—কোথায় চলেছ? আবার প্রশ্ন করে বৈশাখী।

—আয়াঙ্গারের বাংলোয়।

—আয়াঙ্গার কে?

—এস ডি. ও।

বৈশাখীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়, বলে—কী পাগলামি করছ তুমি! জান এর কি পরিণাম হতে পারে?

অসীম ভ্রূ কুঁচকে প্রতিপ্রশ্ন করে—কিসের কি পরিণাম হবে?

—তুমি যদি ওর কথা বলে আস গিয়ে তাহলে কাকাবাবুর অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছ?

—কেন? ডাকাতের-গুলি-লাগা পেশেণ্টের চিকিৎসা করায় তো কোনও অপরাধ হয় না।

—ছেলেমানুষি কোরো না অসীম। ছেলেটির পরিচয় তুমি জান।

—জানি নাকি? তাহলে ডাকাতের কথা মিথ্যা করে বলেও তোমার বয়ফ্রেণ্ডের পরিচয়টা গোপনে রাখতে পার নি তুমি?

বৈশাখী উত্তরে বলে,—না, মিথ্যা কথা আমি বলি নি। তুমিই বুঝতে পার নি। ইংরাজ শাসককে এ বাড়ির একটি প্রাণী ছাড়া সকলেই ডাকাত বলে মনে করে।

অসীম বলে—রাজনীতির তর্ক তোমার সঙ্গে আমি করব না বৈশাখী। ইংরাজ শাসকদের মিত্র বলে আমিও মনে করি না—কিন্তু এ কথাও আমি ভুলতে পারি না যে, প্রভু হিসাবে ইংরাজদের চেয়ে জাপানীরা বেশী মনোরম হবে না। কিন্তু যাক ও কথা—ছাড়ো আমাকে, যেতে দাও।

অসীমের পাঞ্জাবির একটা প্রান্ত তখনও ধরা ছিল বৈশাখীর মুঠিতে। সে বুঝতে পারে অসীমকে ছেড়ে দিলে সে একটা সর্বনাশ করে বসবে এখন। বৈশাখীর উপরেই তার রাগটা হয়েছে সবচেয়ে বেশী,—না হলে কখনও 'বৈশাখী' বলে সম্বোধন করত না তাকে, ডাকত 'সাকী' বলে।

বৈশাখী বলে—এ বাড়ির মধ্যে যদি ও ধরা পড়ে তাহলে আমরা সকলেই ধরা পড়ব—এটা ভেবে দেখেছ?

—ধরা তো তুমি পড়ে গেছ বৈশাখী। নতুন করে আর কি ধরা পড়বে তুমি?

—আমার কথা হচ্ছে না, কিন্তু তুমি কি অন্তত কাকাবাবুর কথাটা ভেবে দেখেছ?

—বাবার কোনও বিপদ নেই এতে—তিনি আমাকে যে কথা বোঝাতে চেয়েছেন সেই কথাই বললেন। তিনি ওকে চিনতে পারেন নি। ভেবেছিলেন সত্যিই বুঝি ডাকাতের গুলি লেগেছে ওর পায়ে। তারপর যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছেন ছেলেটি পলাতক রাজদ্রোহী সেই মুহূর্তেই তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এস. ডি. ও.-র কাছে। এতে তাঁর বিপদটা কোথায় তা তো বুঝছি না আমি।

বৈশাখী ওর হাত দুটি ধরে মিনতিমাখা কণ্ঠে বলে—তোমার পায়ে পড়ি অসীম, এ কাজ তুমি কোরো না।

ভরু কুঁচকে ওঠে অসীমের—ব্যঙ্গের এক চিলতে একটা হাসিও খেলে যায় ওর ওষ্ঠে, বলে—কিন্তু কেন বলো তো? এত কাতরভাবে প্রার্থনা করার কারণটা কি?

—আমার ভয় করছে। আমার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু

ঘটতে যাচ্ছে এই নিয়ে। কাকাবাবু ভীষণ আহত হবেন।

—হওয়াই উচিত। তিনি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। সেটাকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু কর্তব্য কর্ম করার অধিকার তো তাঁর একলার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। আমাকেও করতে হবে—যা আমি করণীয় মনে করছি। তুমি আমাদের বাড়ির আবহাওয়ার কথা জান না। আমার আইডিওলজি আমি অনুসরণ করলে বাবা কখনই কিছু মনে করবেন না।

—তবু আমি তোমাকে মিনতি করছি অসীম···তা ছাড়াও মানে, ··ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না তোমাকে আমার মনের আশঙ্কা··· আমি মিনতি করছি অসীম প্লীজ!

অসীম আর হাস্য সংবরণ করতে পারে না, বলে—নবাবপুত্রী! এ উত্তম!

কি উত্তম অসীম?

—নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম!

—এ-সব কথার মানে?

—মানে আয়েষা বেগমের এ অনুরোধ রক্ষা করা আপাতত ওসমানের পক্ষে অসম্ভব।

ওর হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অসীম।

বৈশাখীর সঙ্গে অসীমের এ সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ করেন নি পরমানন্দ। এ শুধু তাঁর অনুমান। এবং সেইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ। তিনি যদি জানতে পারতেন যে, অসীম আদর্শপ্রণোদিত হয়ে সংবাদ দিতে গিয়েছিল এস. ডি. ও.-র বাংলোতে তাহলে বোধকরি তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারতেন। ক্ষমা না করলেও অন্তত এটুকু সান্ত্বনা তাঁর থাকত যে, দুর্ঘটনাটা শুধুমাত্র পিতাপুত্রের আদর্শগত বিরোধজনিত। কিন্তু আসলে কি তাই? অসীম কি খবর দিতে ছুটেছিল এস. ডি. ও.-কে ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে? শুধু ক্ষণিক উন্মাদনায় কি এ কাজটা করে বসে ও? অবশ্য এ কথা নিশ্চিত যে, তার ফলাফলটা যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা ছিল ঐ নাবালক রাজনীতিকের

দুঃস্বপ্নেরও অগোচর। বোকা ছেলে! সে তার বাপকে চিনতে পারে নি।

—একটা সই লাগবে ডাক্তার সাহেব।

টাইপকরা একখণ্ড কাগজ কে যেন বাড়িয়ে ধরে ওঁর সামনে। কিসের কাগজ ওটা? কে জানে। পরমানন্দ শুধু এইটুকুই দেখলেন একসার সই রয়েছে তাতে। অন্যান্য সব ডাইরেক্টরের দস্তখত করা আছে। না পড়েই একটা সই করে দিলেন পরমানন্দ। কাগজখানা চলে গেল পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের হাতে।

তন্ময়তা ভাঙে নি পরমানন্দের। তিনি ভাবছিলেন সেদিন সন্ধ্যার কথা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ডাক্তার চৌধুরী নিজেই ড্রাইভ করে ফিরছিলেন বাংলোয়। কাঁকরবিছানো লাল পথ দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নীচে। চৌধুরী ডাক্তার গাড়ি থেকে নামলেন। একা। নেমেই দেখেন সন্ধ্যার অনালোকে বাইরে কয়েকখানি চেয়ার পাতা। বসে আছেন আধা অন্ধকারে কয়েকজন ভদ্রলোক। অনুমান তাহলে তাঁর ঠিকই হয়েছিল। অসীম আছে, আছে নীলা এবং মিস গ্রেহাম। সেদিকে অগ্রসর হতেই এস ডি. ও. মিস্টার আয়াঙ্গার বলেন—গুড ঈভনিং ডক্টর চৌধুরী।

প্রত্যভিবাদন করে চৌধুরী সাহেব এসে বসেন একটা বেতের চেয়ারে। মিস গ্রেহাম কয়েক গ্লাস পানীয় প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। নির্বিকার মূর্তি তাঁর। নীলা বসে আছে একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ হাতে। চাঁদ উঠেছে শুক্লা সপ্তমী কি অষ্টমীর। তারই ম্লান আলোয় রক্তশূন্য দেখাল নীলার মুখ। চোখাচোখি হতেই মনে হল কি একটা কথা বলবার জন্য সে যেন ছটফট করছে। চৌধুরী আন্দাজ করেন কথাটা কী। আয়াঙ্গার সাহেবকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন তিনি—অসীম কি কাণ্ডটা করে বসে আছে। অসীম বসে আছে সামনের চেয়ারটায়—মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি।

—কতদূর ঘুরে এলেন?

—এই তো।—অস্পষ্ট জবাব দিলেন উনি সৌজন্যরক্ষার্থে। মিস

গ্রেহাম প্রশ্ন করেন—তাঁকেও একটা পানীয় দেওয়া হবে কিনা। ডাক্তার চৌধুরী সম্মতি জানান।

আয়াঙ্গার সাহেব আর কালবিলম্ব না করে সোজা নেমে আসেন আসল বক্তব্যে—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর চৌধুরী। উপযুক্ত সময়েই আপনি খবর পাঠিয়েছিলেন অসীমবাবুকে দিয়ে। সমস্ত বাড়িটাই আমরা ঘিরে রেখেছি। অপারেশন করে আপনি ভালোই করেছেন—আর তা ছাড়া ওর পরিচয় তো শুনলাম আপনি প্রথমে বুঝতেই পারেন নি। সুতরাং আপনার কোনও আশঙ্কা নেই। নাউ কাম টু পয়েন্টস। কোথায় আছে আপনার পেশেণ্ট?

পরমানন্দ একটু ইতস্তত করে বলেন—নীলা, আমার চুরুটের প্যাকেটটা প্লীজ।

মিস গ্রেহাম উঠে পড়েন—আমি দেখছি।

—প্লীজ লেট হার সেণ্ড ইট।

নীলা শ্রীর পদে উঠে যায়। ইঙ্গিতটা সে বুঝতে পেরেছে। চুরুটের প্যাকেটটা তাকে আনতে বলা হয় নি—পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। নন্দ চুরুটের বাক্সটা এনে নামিয়ে রাখে টেবিলে। তার থেকে একটা বার করে নিপুণভাবে ধরান ডাক্তার সাহেব। বাক্সটা এগিয়ে দেন আয়াঙ্গারের দিকে। তিনিও ধরান একটা।

—কোন পেশেণ্টের কথা বলেছন আপনি?

—যার খবর দিয়ে আপনি আপনার ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে।

—আই থিঙ্ক য়ু আর মিস্টেকন্। আমি তো কোনও খবর পাঠাই নি। অসীম, এ-সব কি শুনছি?

অসীম চমকে ওঠে। কী বলবে তা বুঝতে পারে না। পরমানন্দ যে এটাকে বেমালুম অস্বীকার করে বসতে পারেন এটা তার স্বপ্নেরও অগোচর। সে ভেবেছিল আয়াঙ্গার সাহেব যখন হাতেনাতে আসামীকে ধরে ফেলবেন—তখন পরমানন্দের সামনে দ্বিতীয় কোনও পথ থাকবে না। তাঁর গায়ে কোনও আঁচড় লাগার কথা নয়। তিনিই

ছেলেকে পাঠিয়েছেন আয়াঙ্গার সাহেবের কাছে, গোপনে সংবাদ দিয়ে। তিনি বিপ্লবীটিকে আশ্রয় দেন নি—আটকে রেখেছেন শুধু পুলিস আসা পর্যন্ত। সুতরাং পরমানন্দের এতে বিপদ নেই বিন্দুমাত্র, বরং সরকার থেকে পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু কার্যকালে ঘটনাটা ঘটল অন্য রকম। সদলবলে আয়াঙ্গার সাহেব এসে ঘিরে ফেললেন বাড়িটা। চৌধুরী সাহেবকে পাওয়া গেল না বাড়িতে। গাড়ি নিয়ে একাই কোথায় রুগী দেখতে গেছেন তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাড়ি সার্চ করা হয়ে গেছে। ছেলেটিকে পাওয়া যায় নি। নেই, কোথাও নেই—সেই ছেলেটা।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আয়াঙ্গার বলেন—ডক্টর চৌধুরী! আগুন নিয়ে খেলা করবেন না আপনি। অরুণাভ নন্দী এ বাড়িতে এসেছিল—চার পাঁচ দিন এখানে ছিল—তার সন্দেহাতীত প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অসীমবাবু সব কথা স্বীকার করেছেন আমার কাছে। আর আপনার বাড়ি সার্চ করেই পাওয়া গেছে এই অকাট্য প্রমাণ।

এক বাণ্ডিল কাগজ তিনি বার করে রাখেন সামনের টেবিলে। নিষিদ্ধ প্রচারপত্রের একতাড়া কাগজ। আণ্ডার গ্রাউণ্ড প্রেস থেকে ছাপা। নীলার বিছানার তলা থেকে যে কাগজগুলো একদিন উদ্ধার করেছিল অসীম!

—আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে এগুলি আপনার পুত্র অথবা কন্যার সম্পত্তি। সুতরাং অরুণাভ নন্দী আপনার বাড়িতে এসেছিল, এটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে।

কি জবাব দেবেন বুঝতে পারেন না চৌধুরী সাহেব।

এস. ডি. ও. আয়াঙ্গার কণ্ঠস্বর নীচু করে বলেন—ডক্টর চৌধুরী, আমি জানি, ছেলেটিকে আপনি বাঁচাতে চাইছেন। হঠাৎ অসীমবাবুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে এখন আবার কেন তাকে বাঁচাতে চাইছেন তা অবশ্য জানি না। কিন্তু এখন আর উপায় নেই ডাক্তারসাহেব।

পরমানন্দ তখনও নীরব থাকেন।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনিই অসীমবাবুকে পাঠিয়েছিলেন

কিনা। সম্ভবত আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই খবর দিতে গিয়েছিলেন অসীমবাবু, তাই নয়?

অসীম তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে—না না, আমাকে উনিই পাঠিয়েছিলেন।

আয়াঙ্গার মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন—সম্ভবত কথাটা সত্য নয়—তবু আমি তাই ধরে নিতে রাজী আছি। কারণ আমি চাই না ডক্টর চৌধুরী এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিব্রত হন। নাউ প্লীজ—কোথায় আপনার পেশেণ্ট?

এতক্ষণে মনস্থির করেছেন পরমানন্দ। বলেন,—বলছি, বসুন, আমি আসছি এখনি। উঠে পড়েন চৌধুরী সাহেব।

—এক্সকিউজ মী! আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না আপনি।

—অ্যাম আই আণ্ডার অ্যারেস্ট দেন?

আয়াঙ্গার আর একবার নিম্নকণ্ঠে উচ্চারণ করেন তাঁর শেষ সাবধানবাণী—অনেক আগেই আমার উচিত ছিল আপনাকে অ্যারেস্ট করা। আমি তা করি নি। কারণ আমি ভুলতে পারছি না সেই রাত্রিটির কথা—যে রাত্রে আমার বেবি টাইফয়েড-ক্রাইসিস পার হয়েছিল। আপনি সারারাত্র ছিলেন আমার বাসায়। তবু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে ডক্টর চৌধুরী। আমি আপনাকে শেষবার প্রশ্ন করছি—গাড়ি করে কোথায় পৌঁছে দিয়ে এলেন আপনার পেশেণ্টকে?

—এর জবাব না পেলে আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন?

—অ্যাণ্ড উইথ নো রিগ্রেট। কারণ আত্মরক্ষার পূর্ণ সুযোগ আপনাকে বারে বারে দেওয়া হয়েছে।

—ওয়েল, দেন ডু অ্যারেস্ট মী। আপনাকে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

চীৎকার করে ওঠে অসীম—বাবা!

—ইট্‌স্ টু লেট খোকা! ভুলে যেও না—আমাদের কৃতকর্মের

ফলাফল করবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নীলা রইল, তোমার গ্র্যানী রইল।

আয়াঙ্গার সাহেবের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে পরমানন্দ বলেছিলেন—আমি প্রস্তুত বন্ধু।

ননীমাধব বলেন—চলো, এবার ওঠা যাক। ওঃ! সাড়ে দশটা বাজে! চলো, চলো।

যন্ত্রচালিতের মতো ননীমাধবের সঙ্গে আবার এসে বসলেন মোটরে। এতক্ষণে আবার বর্তমানে ফিরে এসেছেন তিনি। মনে পড়ে যায়—ধর্মঘটের জন্য জরুরী মীটিঙে এসে বসেছিলেন তিনি। মনে পড়ে যায় নীলা চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। কিন্তু এ কি হচ্ছে? এতবড় জরুরী মীটিঙে উপস্থিত থাকলেন পুরো দুটি ঘণ্টা অথচ তিনি কিছুই জানেন না। কী সিদ্ধান্ত হল ডিরেকটরদের সমাবেশে? লকআউট চলতে থাকবে? একবার মনে হল ননীমাধবকে প্রশ্নটা করেন। তারপর নিজেরই কেমন সঙ্কোচ হল। নাঃ, এ রকম মানসিক অবস্থায় ছোটাছুটি করে বেড়ানোর কোনও অর্থ হয় না। আগে তাঁকে স্থির হতে হবে। তারপর কাজ!

—এখান থেকে সোজা জিতেনদার ওখানে যাবে তো?

—না, আমি একবার গুরুদেবের আশ্রমে যাব।

সে কি? সাড়ে দশটায় জিতেনদার বাসায় জরুরী অ্যাপয়েন্টমেণ্ট। কিশলয় গাঙ্গুলীরও সেখানে আসবার কথা। এত বড় একটা সিরিয়স এনগেজমেণ্ট!

সব কথা মনে পড়ে যায় পরমানন্দের। কিশলয়বাবু ভোটযুদ্ধের একজন যোদ্ধা। পরমানন্দের কনস্টিটুয়েন্সি থেকেই অবতীর্ণ হচ্ছেন বিপক্ষ শিবির থেকে। তাঁর পিছনে সম্মিলিত কয়েকটি দলের শক্তি। এই আসনে হয় তিনি অথবা কিশলয়বাবু নির্বাচিত হবেন। আরও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন, অধ্যাপক গিরীন্দ্র বসু। সকলে মনে করেছিল তিনিই নমিনেশন পাবেন পরমানন্দের বদলে। দীর্ঘ দিন জেলে

জেলে কেটেছে তাঁর। আকৈশোর দেশসেবায় যুক্ত আছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁর বদলে পরমানন্দকেই নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। গিরিন্দ্রবাবু অকৃতদার সন্ন্যাসী মানুষ। ভোটযুদ্ধ পাড়ি দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁর নেই। ফলে সকলেই মনে করে এ আসনের জন্য হবে একটা দ্বৈরথ সমর। ধুরন্ধর কয়েকজনের প্রচেষ্টায় কিশলয়বাবুর নাম প্রত্যাহারের একটা সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। কথা আছে জিতেন-বাবুর মধ্যস্থতায় আজই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে কয়েকটি শর্তে কিশলয়বাবু সরে দাঁড়াতে রাজী আছেন। জিতেন বাঁড়ুজ্জে কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত নন। স্থানীয় বারের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। ক্রিমিনাল সাইডের সবচেয়ে নামকরা আইনজীবী। ভোটপ্রার্থীদের যদিও ঠিক ক্রিমিনাল পর্যায়ভুক্ত করার কোনও নজির নেই—তবু ঐ জিতেন বাঁড়ুজ্জের মাধ্যমেই একটা সমাধানে আসার চেষ্টা করেছেন দুপক্ষ। এ কথাও আছে যে, জিতেনবাবুর বাসায় যদি দুপক্ষ একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারেন তখন সকলে আসবেন তারিণীদার কাছে। ওঁরা সকলেই জানেন যে, তারিণীদা ভোটযুদ্ধে যদিও নিজে নামেন নি তবু তিনিই সুইচ-বোর্ড কন্ট্রোল করেন—সে পরিচয়ে পরমানন্দ ল্যাম্পপোস্ট মাত্র।

—তোমার গুরুদেবের কাছে যেতে চাইছ কেন?

—যদি ও তাঁর কাছে গিয়ে থাকে?

—কে? নীলা? পাগল হয়েছ! সে যাবে তোমার গুরুদেবের কাছে? গুরুদেবকে তোমার কত ভক্তি করে সে তা মনে নেই? সেবারকার কথা ভুলে গেছ নাকি?

—কিন্তু তাহলে কোথায় গেল ও? ব্যারাকে খোঁজ নেব?

—সে-সব পরে হবে। এখন চলো তো জিতেনদার ওখানে—

স্টীমারের সঙ্গে বাঁধা গাধাবোটের মতোই ননীমাধবের সঙ্গে চললেন পরমানন্দ। জিতেন বাঁড়ুজ্জের বাসায় হবে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা। নাম প্রত্যাহারের শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে—সুতরাং প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান। কিশলয়বাবু তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক, বাঘাডাঙা কলোনির

সলিড ভোট তাঁর মূলধন। তা ছাড়াও আছে কয়েকটি বিরুদ্ধ পার্টির সম্মিলিত শক্তি। যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা তাঁরও অল্প নয়। অথচ তিনি সরে দাঁড়ালে পরমানন্দের জয়যাত্রার পথ নিরঙ্কুশ। ফলে কিশলয়বাবু আদৌ সরে দাঁড়াতে রাজী হবেন কিনা বলা শক্ত—হলেও তাঁর শর্তগুলি খুব সহজপাচ্য হবে না কিন্তু সম্মত তাঁকে করাতেই হবে। পরমানন্দকে যেতেই হবে অ্যাসেমব্লিতে। না হ'ল দেশের কতটুকু সেবা তিনি করতে পারবেন এখানে থেকে? যে আইনের বলে দেশ চালিত হবে সেই আইন যেখানে জন্ম নেবে, বিভিন্ন খাতে সরকার কত টাকা ব্যয়াদি নির্ধারিত করবেন তা যেখানে স্থির করা হবে, সেখানে যেতেই হবে তাঁকে। তাঁর দেশসেবাকে বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তৃত করে দিতে হবে। আইনসভার মহাযজ্ঞে ঋত্বিক না হতে পারলে তাঁর দেশসেবার বাসনা তৃপ্ত হবে না। এতদিন পরে পার্টি তাঁকে নমিনেশন দিয়েছে- দুর্লভ এ সৌভাগ্য। এত বড় সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি না করতে পারেন তবে আর ভবিষ্যতে আশা নেই। পারবেন, নিশ্চয়ই পারবেন তিনি কিশলয়বাবুকে রাজী করাতে—উঠতেই হবে তাঁকে সাফল্যের শিখরচূড়ায়। ওখানেই যে তাঁর যাত্রা শেষ হবে তাই বা কে বলতে পারে যেতে পারেন ক্যাবিনেটেও একদিন।

আর হতভাগা মেয়েটা বলে কিনা তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট। তিনি স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে ছুটে চলেছেন একমুখো। দেশের কথাই তাঁর কাছে নাকি শেষ কথা নয়—নিজের কথাই তিনি শুধু ভাবেন। নিজের কী কথা? কোন স্বার্থ? অন্যায়ভাবে তিনি কি জীবনে একটি রজতখণ্ডও উপার্জন করেছেন? অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজ তিনি যুক্ত। অনেক ক্লাবের পেট্রন, কয়েকটির উপদেষ্টা, কিছুসংখ্যকের কোষাধ্যক্ষ। একটি পয়সাও কখনও এদিক ওদিক হয়েছে তাঁর হাতে? তবে? স্বার্থ! কোন স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে তিনি অকনাভ নন্দার সন্ধান দিতে অস্বীকার করেছিলেন সেদিন? আয়াঙ্গারকে যদি সেদিন তিনি বলে দিতেন সেই সন্ধ্যায় কোন পথের কোন বাঁকে কাদের জিম্মায় নামিয়ে দিয়ে এসেছিলেন সেই অসুস্থ মানুষটাকে তাহলে এত নির্যাতন সহ্য করতে

হত না তাঁকে।

নির্যাতন! কী অপরিসীম যন্ত্রণাময় সে দিনগুলো!

দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক ছিলেন তিনি। রাজদ্রোহের অপরাধে তখন প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা ছিল না। নিরাপত্তা আইনেই আটক ছিলেন দীর্ঘদিন। অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল বৃদ্ধের উপর— তবু একটি কথাও বার হয় নি তাঁর মুখ দিয়ে। হ্যাঁ, অসীম ঠিকই বলেছে। অরুণাভ নন্দী নামে একটি ছেলে আশ্রয় নিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। তাঁর পায়ে তিনি অপারেশনও করেছিলেন। সন্দেহ হওয়ায় ছেলেকে পাঠিয়ে এস. ডি. ও-কে খবরও দিয়েছিলেন। তারপর কি করে সে তাঁর বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল তা তিনি জানেন না। এই তাঁর জবানবন্দি।

অসীম পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। ঘরে-বাইরে অপমানের চূড়ান্ত হ'ল তার। সেই নাকি বাপকে ধরিয়ে দিয়েছে! তবু অসীমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই বিচার উঠল আদালতে। বোকা ছেলে! কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বের হয়ে পড়ল সাপ। সন্ধানী পুলিসের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হল পরশুরাম চৌধুরীর জীবনবৃত্তান্ত। প্রমাণিত হল পরশুরাম আর পরমানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি। যেটুকু আশা ছিল পরিত্রাণের নির্মূল হল তা। যারা ওর 'জাপানকে রুখতে হবে', চীৎকারে বিরক্ত ছিল তারা বললে অসীমই প্রকাশ করে দিয়েছে বাপের বিপ্লবী জীবনের গোপন ইতিহাস। কথাটা পরোক্ষভাবে সত্য। বিচারের প্রচেষ্টা না করলে হয়তো তাঁর যৌবনের ইতিহাস এমনভাবে জানাজানি হয়ে পড়ত না। চিহ্নিত হয়ে পড়লেন পরমানন্দ—বিপ্লবীর সহকারী বলে নয়—স্বয়ং রাষ্ট্রদ্রোহী বলে।

ধরা পড়েছিল অরুণাভও। সে কিন্তু তার জবানবন্দিতে অস্বীকার করেছিল পরমানন্দের পরিচয়। না, তার পায়ের উপর পরমানন্দ অপারেশন করেন নি। কে করেছিল? তা সে বলবে না।

অসীমের অবস্থাটা কল্পনা করা শক্ত নয়। বেয়াল্লিশের আন্দোলন তখন অতীত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। লালকেল্লায় ঐতিহাসিক বিচার

তখন চলছে আজাদ হিন্দ নেতাদের। জাপানকে রুখবার জন্য কয়েক বছর আগে যারা উঠেপড়ে লেগেছিল—তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করা কষ্টকর বোধ করছে। অসীমের অবস্থা আরও করুণ। বাড়িতে কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। নীলা তো নয়ই, মিস গ্রেহামও নয়। বৈশাখী পর্যন্ত ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নন্দ-বেহারাও ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। মামলার জন্য তদ্বির তদারক সমস্ত করতেন ননীমাধব। বন্ধুর কর্তব্যে ত্রুটি হয় নি তাঁর। এমন কি এজন্য রাজরোষে পড়বার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিরত হন নি বন্ধুকৃত্য থেকে। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল নীলা। মিস গ্রেহাম শয্যা গ্রহণ করলেন। এই শয্যাগ্রহণই তাঁর শেষ শয়ন। দেশে আর ফিরে যেতে পারেন নি তিনি। দীপক আসত সকাল-সন্ধ্যায়। নীলার সঙ্গে পরামর্শ করত। মামলা-সংক্রান্ত কথাবার্তা হত। কখনও বসত মিস গ্রেহামের শয্যাপার্শ্বে। বৈশাখীকে ডেকে হয়তো দুটো পরামর্শ দিত। তারপর যাবার সময় বারান্দা থেকেই দেখে যেত অসীম বসে আছে নিজের ঘরে জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে। কখনও কখনও সিঁড়ির মুখে মুখোমুখি দেখা হয়েছে দুজনের। দীপক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে নীরবে। দীপক অসীমের সহপাঠী ছিল একদিন!

যেদিন মামলার দিন পড়ত সেদিন দেখা যেত অসীমকে আদালতের কামরায়। কেউ তাকে ডেকে নিয়ে যেত না, কেউ তার সঙ্গে একসঙ্গে ফিরত না। ও নিজেই খবর রাখত মামলার দিন কবে পড়েছে। ঠিক সময়ে ম্লান মুখে এসে দাঁড়াত জনারণ্যের একান্তে। হয়তো কেউ চিনে ফেলত তাকে—ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে ওরা কি যেন বলাবলি করত। কি যে ওরা আলোচনা করে তা আন্দাজ করতে পারত অসীম—তাই চোখ তুলে তাকাত না কখনও। তবু না গিয়েও পারত না, ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেত সামনের একখানা বেঞ্চিতে ননীমাধব, দীপক আর নীলা বসে আছে উকিলবাবুর কাছে। দেখত চোখ তুলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লোকটাকে! একদৃষ্টে

চেয়ে থাকত সেদিকে। তারপর কোর্ট বন্ধ হলে জনারণ্যে মিশে যেত—পাছে ওকে কেউ ডাকে একসঙ্গে বাড়ি যেতে। যদি চোখাচোখি হয়ে যায় নীলা অথবা ননীমাধবের সঙ্গে।

একদিন সাহসে ভর করে সে গিয়ে হাজির হয়েছিল ননীমাধবের বাসায়। ননীমাধব ওর মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অসীম কাঁদে নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল সে। নিজের ঘরে বসে থাকত দিনরাত। কদাচিৎ বার হত ঘর থেকে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই সঙ্গোপনে উদ্‌যাপিত হত তার স্বেচ্ছাবন্দী জীবনের দিনগুলি। নন্দ তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যেত চা, খাবার, ভাতের থালা। একসঙ্গে ডিনার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন। খাবার অভুক্ত পড়ে থাকলেও কেউ এসে অনুযোগ করত না। উঠিয়ে নিয়ে যেত অভুক্ত থালাখানা। বাপের মামলায় সাক্ষী দিতে হয়েছিল তাকেও। কি বলেছিল তার মনে নেই। মাটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের জবাব দিয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘদিন চলে মামলা। নীলা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, বৈশাখী না থাকলে বোধহয় মারাই পড়ত বেচারি। নীলার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট করত অসীম। দিন দিন ম্লান-হয়ে-আসা ছোট বোনটির চেহারা দেখে হু হু করে উঠত অসীমের সারা অন্তঃকরণ—কিন্তু উপায় নেই। ছোট বোনটির মাথায় হাত বুলিয়ে ছুটো সান্ত্বনার কথা বলার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত।

তারপর মামলার রায় বের হয়ে এল একদিন।

রাজদ্রোহী পরশুরাম চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! ঐ বৃদ্ধের!

অবিচলিত চিত্তে সে আদেশ করলেন পরমানন্দ।

অসীম ছিল আদালতে। থরথর করে কেঁপে উঠল সে দণ্ডাদেশ শুনে। বসে পড়ল ধুলার উপরেই। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এল পৃথিবী!

সংবিৎ যখন ফিরে এল তখন আদালত জনশূন্য। ঝাড়ুদার ঝাঁট

দিচ্ছে বারান্দাটায়। একটা পেয়াদা শ্রেণীর লোক একগোছা চাবি হাতে ঘরে ঘরে তালা লাগিয়ে চলেছে। তারই ডাকে সংবিৎ ফিরে আসে অসীমের। ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকায়। কোথায় গেল এতগুলো লোক? সন্ধ্যা নেমে এসেছে পৃথিবী জুড়ে। রাস্তায় জ্বলে উঠেছে বিজলী বাতি।

অসীম উঠে দাঁড়ায়। ঝাড়ুদার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চাবি হাতে পেয়াদাটা তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। আদালতের কার্নিসে একজোড়া পায়রার নিভৃত কূজন ছাড়া চরাচর স্তব্ধ। মাতালের মতো টলতে টলতে চওড়া সিঁড়িটা বেয়ে নীচে নেমে আসে। অনেকক্ষণ তাহলে বসে ছিল সে ঐ ধুলার উপর। আজ আদালতে নীলা এসেছিল--ছিলেন ননীমাধব আর দীপক। তারা কখন গেল? যাবার সময় নিশ্চয় তারা দেখেছিল দ্বারের পাশে মাটিতে বসে আছে অসীম। আশ্চর্য! আজকের দিনেও তারা প্রয়োজন বোধ করল না তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার। কেন? সেও কি ঐ পরমানন্দের সন্তান নয়। তার বুকের ভিতরটাও কি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না আজ? সে কি ইচ্ছা করে এই সর্বনাশ ডেকে এনেছে! এ যে নিয়তির একটা চরম নিষ্ঠুর পরিহাস তা কি কেউ একবার ভেবে দেখবে না! না, অসীমের চোখ দিয়ে কেউ দেখল না একবার বিয়োগান্ত নাটকের এ দিকটা!

হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে অসীম এসে পৌঁছায় সেই পরিচিত পয়েন্টিং-করা লাল বাড়িটার সামনে। প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে দুর্গের আকারের ঐ বাড়িটা। আলো জ্বলছে না সামনের কোনও জানালায়। কোথাও প্রাণের কোনও সাড়া নেই। সদ্যোবিধবার মতো মূর্ছাতুর প্রাসাদটা আজ মৌন—স্তব্ধ। গেট খোলাই ছিল। চিরদিনের মতো গেটের ডান পাশে দারোয়ানের ছোট্ট ঘরটার সামনে চারপাইয়ে বসেছিল দারোয়ান উদাস দৃষ্টি মেলে। ব্যতিক্রমের মধ্যে আজ আর সে উঠে দাঁড়াল না তার ছোট হুজুরকে দেখে। হয়তো ঐটুকু অসম্মানের মধ্যেই বেচারি জানাতে চাইল তার প্রতিবাদ। অপমানটা বাজল না অসীমের। সে লক্ষ করে নি এ-সব। লাল কাঁকর-বিছানো

পথটাও যে ও প্রতি পদক্ষেপে অব্যক্ত ভাষায় প্রতিবাদ জানাল তাও কানে বাজে না তার। অবশেষে এসে পৌঁছায় গাড়িবারান্দার তলায়। ভিতরে প্রবেশ করতে মন হল না। বসে থাকে দ্বারের পাশে মেজের উপরেই।

বাড়ির গাড়িটা এসে পৌঁছায় অল্প পরেই। ধরাধরি করে ওরা নামাল নীলাকে। আদালত থেকে ফিরছে সে। এত দেরিতে? হবে না? দণ্ডাদেশ শুনে নীলা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। আদালত থেকে তাই ওকে নিয়ে যাওয়া হয় ননীমাধবের বাড়িতে। সেটা আদালত থেকে কাছে। এতক্ষণ সেখানেই ছিল সে। অল্প সুস্থ হওয়ার পর ওকে নিয়ে আসা হচ্ছে। দীপক আর ননীমাধবের সাহায্যে টলতে টলতে নীলা নেমে এল গাড়ি থেকে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তার। খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে পিঠের উপর। কাপড় ও ব্লাউসের অনেকটা ভেজা। মুখ আর মাথাও। বোধহয় জলের ঝাপটা দেওয়া হয়েছিল—শুকোয় নি এখনও। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের লাল। কোনদিকে তাকায় না নীলা। লক্ষ্য হয় না অসীমকে। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের সঙ্গে যেন মিশে যেতে চায়। ওকে কেউই গ্রাহ্য করে না। নীলাকে ওরা নিয়ে এসে শুইয়ে দেয় ড্রইংরুমের একটা সোফায়।

অসীম ভয়ে ভয়ে নন্দকে প্রশ্ন করে—ডাক্তার দেখানো হয়েছে?

নন্দ একবার থেমে পড়ে। কি যেন বলতে যায়। তারপর কিছু না বলেই চলে যায় ভিতরে।

অসীম বসেই থাকে বাড়ির প্রবেশপথের ধারে।

এ বাড়িতে সে অপ্রয়োজনীয়। শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়—অবাঞ্ছনীয়। এ বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই তার। সম্পর্ক নেই বা কেন? সবাই জানে সে-ই এ চরম সর্বনাশের মূল! সমস্ত জেনেশুনেও নাকি বাপকে ধরিয়ে দিয়েছে সে। কলঙ্কের বোঝা নিয়ে কেমন করে দাঁড়াবে অসীম দুনিয়ার সামনে? এত বড় লজ্জার বোঝা বহন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব?

দীপক বেরিয়ে আসে একটু পরেই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। কে জানে কোথায় গেল ও।

অসীম মনে মনে বলতে থাকে : তুমি তো জানতে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কেন এমন করে দলিত মথিত করে গেলে আমাকে? কেন সমস্ত অপরাধের বোঝা এমন করে তুলে নিলে নিজের মাথায়? কেন গোপন করেছিলে আমাদের কাছে, তোমার যৌবনের ইতিহাস? কেন, কেন, কেন···?

···আচ্ছা, বাবা এখন কি করছেন? খুব কি ভেঙে পড়েছেন? দণ্ডাদেশ শোনার পর সে যেমন ধুলার উপর বসে পড়েছিল, তিনিও তেমনি করে ভেঙে পড়েছিলেন? যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অর্থাৎ লৌহকপাটের ওপারেই ফেলতে হবে তাঁকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস! তাঁর পায়ের উপর মুখ রেখে জীবনের শেষ ক্ষমা চেয়ে নেবার সুযোগ আর আসবে না অসীমের জীবনে।···আচ্ছা, চুরুট না খেয়ে কেমন করে আছেন তিনি। রাজবন্দীদের কি চুরুট খেতে দেয়? ওঁকে কি সেই ডোরাকাটা একটা জামা পরিয়ে দিয়েছে! শিউরে উঠল অসীম। স্পষ্ট দেখতে পেল বাপের সেই মূর্তিটা। নীল-সাদা ডোরাকাটা একটা হাতকাটা জামা, আর হাফপ্যান্ট পরা ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন লোহার গরাদ দুটো ধরে—দুই গরাদের ফাঁকে চেপে ধরেছেন গলাটা।

আর্তনাদ করে ওঠে অসীম—বাবা!

হঠাৎ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ছেলে মানুষের মতো।

কতক্ষণ ঐভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। গাড়ির শব্দে আবার মুখ তুলে তাকায়। গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। ডাক্তার বাবুকে নিয়ে দীপক নেমে আসে। পাশ দিয়ে চলে যায় ওরা ভিতরে। ওকে অন্ধকারে ওভাবে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন ডাক্তারবাবু : এ কে? এমনভাবে বসে আছে কেন ওখানে?

ও অসীম। ডাক্তার চৌধুরীর ছেলে।

—আই সী। দ্যাট সান?

—হ্যাঁ, আপনি ভিতরে আসুন।

ওরা চলে যায়।

দ্যাট সান্। সেই ছেলে। যে ছেলে পিতৃঋণ শোধ করেছে বাপকে জেলে পাঠিয়ে! যে ছেলে···

না! আর পারবে না অসীম। একটা কিছু এখনি করতে হবে। হঠাৎ ওর বাহুমূল ধরে কে যেন আকর্ষণ করে।

—কে? ও, বৈশাখী!

—ওপরে যাও।

—কেন?

—পথের উপর এভাবে বসে থেকে একটা সীন কোরো না!

টলতে টলতে উঠে যায় অসীম দোতলায় নিজের ঘরে।

—নামো এবার।

নেমে আসেন পরমানন্দ ননীমাধবের অনুরোধে। জিতেন বাড়ুজ্জের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছেন ওঁরা। এইবার শুরু হবে রাজনৈতিক বুদ্ধির লড়াই। সাদরে ওঁদের ঘরের ভিতর নিয়ে বসান জিতেন বাবু! বড় ঘর। চতুর্দিক আলমারিভর্তি আইনের বই। পিছনের দেওয়ালে বিরাট বড় একটা বাঁধানো ফটো। সম্ভবত জিতেনবাবুর স্বর্গত পিতৃদেবের। তিনিও নামকরা উকিল ছিলেন বোধহয়। উকিলের পোশাকেই তোলা ছবি। কিশলয়বাবুও এসেছেন। একক। আবার মামুলী সৌজন্য বিনিময়ের পালা। কিন্তু সময় অল্প, সুতরাং সোজা আলোচনা শুরু করতে হয়। পাটোয়ারী বুদ্ধিতে কিশলয়বাবু কিন্তু কম যান না। তবে পরমানন্দের পক্ষেও আছেন ননীমাধব। তিনি লক্ষ্য করেছেন পরমানন্দের ভাবান্তর। এজাতীয় সেন্টিমেণ্টাল লোক নিয়ে ভারি মুশকিল। ননীমাধবই অলোচনা চালান বন্ধুর পক্ষ থেকে।

কিশলয়বাবু পশ্চাদ্‌পসরণ করতে গররাজী নন এবং শর্তও তাঁর মাত্র একটি। সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার জন্য এ জেলায় একটি গ্রামনগরী

স্থাপনের কথা। দুটি স্থানের মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচন এখনও সমাপ্ত হয় নি। রতনপুর আর বাঘাডাঙা। রতনপুর এককালকার বর্ধিষ্ণু অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমানকার ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম। বড় বড় মোটা থামওয়ালা ছোট-ছোট পাতলা ইঁটের প্রাসাদ হৃতগৌরব জমিদারদের শেষ স্মৃতি বহন করছে। সেখানকার ভূতপূর্ব রায়সাহেব আর রায়বাহাদুর জমিদারেরা তদ্বির তদারক করছেন রতনপুরেই গ্রামনগরী প্রতিষ্ঠা করার। অপর পক্ষে বাঘাডাঙা হচ্ছে মাঠের মাঝখানে হঠাৎ-গড়ে-ওঠা গ্রাম—পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্‌বাস্তু এসে বসেছে সেখানে দলে দলে। কিশলয়বাবু এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। অল্পমূল্যে এই ডাঙাজমিটি তিনি ক্রয় করে উদ্‌বাস্তু পত্তন করেছেন। কিশলয়বাবু এবং তাঁর পার্টি চান এই বাঘাডাঙাতেই প্রতিষ্ঠিত হোক প্রস্তাবিত গ্রামনগরী। কিশলয়বাবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে রাজী আছেন যদি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তাঁদের পছন্দমত বাঘাডাঙাতেই নতুন গ্রামনগরী গড়ে তোলার অনুমোদন দেওয়া হবে।

দেশবিভাগের আগে পূর্ববঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে কিশলয়বাবু যুক্ত ছিলেন—এখনও আছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অনেক পরিবার এসে বসেছে বাঘাডাঙায়। একটা অবলা আশ্রমও করেছেন ওখানে কিশলয়বাবু—মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদের নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় মেতে আছেন উনি। কো-অপারেটিভও গড়ে তুলেছেন একটা ওদের নিয়ে। বাঘাডাঙা সমাজ-উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল নির্বাচিত হলে এই উদ্‌বাস্তু নরনারীগুলির অশেষ উপকার হয়। গ্রামনগরীর অচ্ছেদ্য অংশরূপে আসবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুলিশ ফাঁড়ি, কমিউনিটি হল, বাজার, ছোটখাট শিল্পপ্রচেষ্টা। জমজমাট হয়ে উঠবে অঞ্চলটা। এ-সবই জানেন পরমানন্দ। কিশলয়বাবু যে ঐ উদ্‌বাস্তু নরনারীগুলির স্বার্থে এতবড় আত্মত্যাগ করেছেন এতে মনে মনে খুশীই হলেন তিনি। তবু বলেন : কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেবার কতটুকু অধিকার আছে আমার ? আমি যদি রিটার্নও হই—তবু আমার ইচ্ছায় তো সি. ডি. পি. টাউনশিপের স্থান নির্বাচন হবে না।

কিশলয়বাবু হেসে বলেন : অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ ? আপনার ক্ষমতা কি ? আপনি তো ল্যাম্পপোস্ট মাত্র।

—তাহলে এ অন্যায় অনুরোধ করছেন কেন ?

—ডাক্তার চৌধুরী, আমি ছেলেমানুষ নই। রাজনীতি করে আমারও চুল পেকেছে। ঐ লোকগুলো ল্যাম্পপোস্টকেই ভোট দিয়ে আসে কেন জানেন ? কারণ তারা জানে যে, ঐ চলৎশক্তিহীন একেপায়ে খাড়া ল্যাম্পপোস্টগুলোর সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ আছে এক-গোছা তারের। সে তারের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যুৎ বয়ে যায় তাতে ৪৪০ ভোল্ট কারেন্ট। শুধু এখানেই শেষ নয়—সে তার আবার যুক্ত আছে কে. ভি. লাইনের সঙ্গে। তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে মেন গ্রিট সিস্টেমের। ল্যাম্পপোস্ট নড়ে বসতে পারে না—কিন্তু তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে যে বৈদ্যুতিক তার—তার ক্ষমতা অসীম।

পরমানন্দ কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ননীমাধব বলেন—তাহলে সেই প্রাইম-মুভারের সঙ্গে পরামর্শ না করে কি করে আমরা প্রতিশ্রুতি দিই বলুন।

—সে তো বটেই। তবে আপনারা না পারলেও আপনাদের কিং-মেকার-অভ-দি-ডিস্ট্রিক্ট এ বিষয়ে আমাকে কথা দিতে পারেন। অন্তত একটা ট্রাঙ্ক করার পর তিনি জানাতে পারেন।

হা-হা করে হাসতে থাকেন কিশলয় গাঙ্গুলী।

—বেশ, তবে তাঁর কাছেই চলুন যাওয়া যাক। পরমানন্দ বলেন।

বাধা দিয়ে ননীমাধব বলেন—কিন্তু তাহলে আপনাকেও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে হবে কিশলয়বাবু। আরও একটি কাজ আপনার করতে হবে এই সঙ্গে।

—বলুন।

—আমাদের ফ্যাক্টরির ধর্মঘটটা তুলে নিতে হবে। বাঘাডাঙা বিষয়ে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পেলে আপনাকে বিনা শর্তে ধর্মঘটটা বন্ধ করতে হবে।

—এ আপনি কী বলছেন ননীমাধববাবু ? আপনাদের কারখানায়

স্ট্রাইকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু?

পরমানন্দের কাছে কথাটা খুবিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারখানার শ্রমিকেরা কোনও রাজনৈতিক দলযুক্ত নয়। ওদের কোনও স্বীকৃত মজদুর ইউনিয়নও নেই। সুতরাং কিশলয়বাবু কেমন করে এজাতীয় প্রতিশ্রুতি দেবেন? সে কথাই হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই ননীমাধব বলে ওঠেন—মিস্টার গাঙ্গুলী, ছেলেমানুষ আমরাও নই। আপনি তো সামান্য চড়াই পাখি। কতটুকু ক্ষমতা আপনার? তবু ঐ সংস্কৃত শ্লোকটাই বলছে নাকি যে সামান্য টিট্টিভ পক্ষীও সমুদ্রকে ব্যাকুল করে তুলতে পারে! আপনার পার্টি টাকা না ঢাললে একাদিক্রমে বাইশ দিন স্ট্রাইক চালাতে পারে কোন শ্রমিক দল—যাদের ইউনিয়ন পর্যন্ত নেই? অবশ্য আপনি বলতে পারেন, নিজ দায়িত্বে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়—তা, কি বলে ভালো, আপনাদেরও একজন লীডার-অভ-দি-অপোজিশন পার্টি-মেকার আছেন না এ জেলায়—তাঁর সঙ্গেই না হয় একটু কথা-বার্তা বলে নিন টেলিফোনে।

কিশলয়বাবুর হা-হা-করা হাসিটা এতক্ষণে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে ননীমাধবের কণ্ঠে।

ভালোমানুষ জিতেন বাঁড়ুজ্জে বলেন—একটু চা হোক এবার?

কেউ কর্ণপাত করে না কথাটায়।

কিশলয় বলেন—আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে মশাই। আমি এই রকম খোলাখুলি কথাই ভালোবাসি। এককালে ফ্লাশ খেলতাম, জানলেন, কিন্তু ব্লাইণ্ড খেলি নি কোনদিন। পাওয়ামাত্র তাস তিনখানা টিপে টিপে দেখে নিতাম—তারপর হাত বুঝে স্টেক করতাম।

—আপনি খেলেন না কি তেতাশ? তাহলে আসবেন না আমাদের বোর্ডে। আমরা তো রোজই সন্ধ্যার পর···

ননীমাধবকে থামিয়ে দিয়ে কিশলয়বাবু হেসে ওঠেন, সীয়ারাম, সীয়ারাম! ভুলে যাচ্ছেন কেন আমরা বিপক্ষ শিবিরের লোক।

আমরা সর্বহারার দলে আর আপনারা হচ্ছেন ক্যাপটালিস্ট বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। আপনাদের ক্লাবঘরের দরজায় মাথা গলাতে দেখলে যে আমাদের আর লোকে বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

—আহা, সেইজন্যেই তো ক্লাবঘরে একটা পিছনের দরজা বানানো হয়েছে।

দুজনেই হেসে ওঠেন আবার।

—কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। আপনাদের স্ট্রাইকের কথা। হ্যাঁ, ওটার ব্যবস্থাও হতে পারে—কিন্তু একেবারে মৌফতসে ওটা কি করে আশা করেন আপনি ননীবাবু? বাঘাডাঙার এক্সচেঞ্জে আমি উইথড্র করতে রাজী আছি। দি ডীল ইজ্ কমপ্লীটেড। এই একই ট্র্যানজাকশনে যদি আপনাদের ধর্মঘটটাও জুড়ে দিতে চান তবে অমার তরফেও একটা এন্ট্রি হওয়া উচিত, নয় কি? ফর এভরি ডেবিট দেয়ার শুড বি এ ক্রেডিট—না হলে ব্যাল্যান্স শীট মিলবে কেন অ্যাঁ?

যেন চরম রসিকতা হল একটা। দুজনেই আবার হেসে ওঠেন।

অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন পরমানন্দ। এ কি মেছোহাটায় এসে পড়েছেন তিনি! দুজনেই দেশসেবা করতে চান—অথচ রাষ্ট্রের আইনে একজনই পেতে পারেন সে অধিকার। সুতরাং একজন যাবেন আইনসভায়—অপরজন তাঁকে স্থান ছেড়ে দেবেন। যিনি স্বার্থত্যাগ করছেন তিনি কতকগুলি সুবিধা পাবেন; কিন্তু সে সুবিধা আদর্শগত, নীতিগত হবে, এটাই পরমানন্দের আশা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো সেই নৈর্ব্যক্তিক স্থূলতামুক্ত থাকছে না।

—বেশ বলুন, কেমন করে ব্যালান্স শীট মেলানো যায়। প্রশ্ন করেন ননীমাধব।

কিশলয়বাবু চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বার করেন একটি নীল কাগজের ব্লু-প্রিণ্ট। বাঘাডাঙা মৌজার সেট্‌ল্‌মেণ্ট ম্যাপ। প্রস্তাবিত গ্রামনগরীর এলাকাটায় একটা লাল দাগ দেওয়া। তার ভিতরে রেল-লাইনের বরাবর সমান্তরাল লম্বা একটি ফালি জমির উপর নীল পেন্সিলের ডোরা কাটা।

কিশলয় গাঙ্গুলী বলেন—প্রস্তাবিত টাউনশিপের সীমানা হচ্ছে এই লাল-পেন্সিলের অংশটা। তার ভিতর এই নীল-পেন্সিলের দাগ দেওয়া এই কটা প্লট ডি-রিকুইজিশন করিয়ে দিতে হবে।

—কতটা জমি হবে ওটা?

—দাগ নম্বর ১১০৭ থেকে ১১১৩, একুনে তেতাল্লিশ একর।

—ব্রেভো! হেসে ওঠেন ননীমাধব। বেশ, চলুন তাহলে, আর দেরি করা নিরর্থক।

ওঁরা উঠে পড়েন। সদলবলে রওনা হয়ে পড়েন তারিণীদার আস্তনার উদ্দেশ্যে।

কিছুই ভালো লাগছিল না পরমানন্দের। কোথায় যেতে পারে মেয়েটা? সত্যিই কি কুলি-ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সে? এতটা নীচে সে নেমে যাবে? সকলেই চেনে তাকে—ডাক্তার চৌধুরীর কন্যা বলে। ওখানে গিয়ে যদি আশ্রয় নিয়ে থাকে তাঁর বিদ্রোহী আত্মজা তাহলে লোকসমাজে তিনি মুখ দেখাবেন কি করে? মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করে তুলেছেন। ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করেছে নীলা। বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—নীলা রাজী হয় নি। কারাণটা জানা ছিল না এতদিন—সম্প্রতি জেনেছেন। অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল প্রথমটা। তারপর বুঝেছেন, এ দুনিয়াতে বিশ্বাসের অতীত সত্যই কোনও কিছু নেই হয়তো। কৈশোরে যে মেয়েটির দেব-দ্বিজে ভক্তির ছিল বাড়াবাড়ি—পরবর্তী জীবনে সেই হয়ে উঠেছিল নাস্তিকতার কালাপাহাড়। অথচ কী আশ্চর্য-শৈশবে কৈশোরে সে মানুষ হয়েছিল বিজাতীয় আবহাওয়ায়। মায়ের ও দিদিমার প্রভাবে তার পক্ষে বার-ব্রত-পূজা-অর্চনার দিকে ঝোঁকাটা সে যুগেই ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মেতেছিল ঐ-সব নিয়ে। হয়তো তার ঐ-সব ব্রতপূজার জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হত বলেই সে বেশী জোর দিয়ে করত সেগুলো। বরাবরই একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল তার রক্তে। স্কুলের দিদিমনিদের কাছ থেকে গঙ্গাস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে বাথরুমে সে জল ঢালত

মাথায়। আজও স্পষ্ট মনে আছে পরমানন্দের—বাথরুমের দরজা ভেদ করে বেরিয়ে আসত শীতে-কাঁপুনি-ধরা নীলার কাঁপা কণ্ঠ—'মাতর্গঙ্গে তৈ যো ভক্তঃ'। আরও একদিনের ঘটনার কথা মনে পড়ছে আজ। ও তখন বোধহয় ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়ত—ফিফ্‌থ ক্লাস তো নয়, ওরা বলত ক্লাস সিক্স। অর্থাৎ ম্যাট্রিক দেবার তখনও বছর চারেক বাকি। একদিন হাউমাউ করতে করতে নীলা এসে হাজির বাপের দরবারে। কী ব্যাপার? না, দাদা আমার পুণ্যিপুকুর নষ্ট করে দিয়েছে। কি পুকুর? না, পুণ্যিপুকুর। পুণ্যিপুকুর আবার কি রে বাবা? অনুসন্ধান করতে হয় ব্যাপারটা। তদন্তের পর বোঝা গেল, বাগানের এক কোণায় আছে একটা ছোট গর্ত। তার চারপাশে কিছু শুকনো ফুল, বেলপাতা আর পুকুরের মাঝখানে কিছু মুরগীর পালক—মাটিচাপা দেওয়া। জরুরী আদালত বসেছিল সেদিন বাড়িতে। বাদী নীলা, আসামী অসীম, সাক্ষী নন্দ-বেয়ারা আর বিচারক স্বয়ং পরমানন্দ। আসামী দোষ অস্বীকার করে বসায় মামলাটা বাঁকা পথ ধরল। জবানবন্দিতে আসামী বলে—হ্যাঁ, মুরগী একটা কেটে খেয়েছিল বটে ওরা কজন বন্ধু মিলে। বেওয়ারিশ মুরগী, কার তা জানে না,—উড়ে এসে পড়েছিল বাগানে। তার ঠ্যাং আর পালকগুলো তাড়াতাড়ি সমাধিস্থ করার প্রয়োজন বোধ করেছিল ওরা। তৈরী গর্ত পাওয়ায় পরিশ্রমটা লঘু হয়েছিল তাদের। পুণ্যিপুকুর কি তারা জানে না। তা তো স্বয়ং বিচারকও জানেন না। বাদী তখন বিচারককে বুঝিয়ে দেয় পুণ্যিপুকুরের মাহাত্ম্য। কি যেন শোলোকটা? মনে নেই এতদিন পরে। খালি একটা কথা মনে আছে—'আমি সতী লীলাবতী!' ঐ কথটা তাঁর বেণীদোলানো মেয়েটির মুখে শুনে হোহো করে হেসে উঠেছিলেন সেদিন। বিচারকের এই ব্যবহারে আদালত অবমাননার ভয় না করে বাদী সেদিন সভাত্যাগ করেছিল প্রতিবাদে।—বেশ! বুঝলাম। তুমিও তাহলে ঐ দলে। বারবার ওকে ফিরে ডেকেছিলেন। ফেরেনি অভিমানিনী মেয়েটি—না। শুনব না আমি তোমার কথা। তুমিও ঐ দলে।

তুমিও ঐ দলে।

কোন দলে? সেদিন বালিকাবয়সী নীলা বলেছিল—তুমি ঐ দলে। অর্থাৎ দাদার মতো নাস্তিকদের দলে—যারা পুন্যিপুকুরের মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী। শুনে হেসেছিলেন তিনি। আরও বছর পাঁচেক পরে ঐ একই অভিযোগ এনেছিল অসীম।—বলেছিল—'তুমিও তাহলে ঐ দলে!' অর্থাৎ নীলার দলে, বিপ্লব-অনুরাগীদের দলে। সেবারও তিনি হেসেছিলেন। আজ আবার নীলা বলছে ঐ কথাই -- তুমিও ঐ দলে। এবার, ঐ দল হচ্ছে স্বার্থপর আত্মভোগীদের দল।

এবারও হেসে উড়িয়ে দেবেন পরমানন্দ।

চিরদিন তিনি একটিমাত্র দলেই আছেন—সত্যধর্মের দলে। বিবেকবুদ্ধি যা ভালো বলে বুঝেছে—তাই সবলে আঁকড়ে ধরেছেন। একচুলও বিচ্যুত হন নি নিজের দৃঢ়মত থেকে। সে কথা নীলা জানে। তাই এ কথাও তার বোঝা উচিত ছিল যে, হুমকি দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না। নীলা যদি তাঁকে ত্যাগ করে ঐ কুলি-বস্তিতেই গিয়ে আজ আশ্রয় নেয়—তো নিক। সেই ভয়ে তিনি পশ্চাদপসরণ করবেন না নিজ আদর্শ থেকে। যে পথে বৃহত্তর মানবসমাজের, প্রভূততর কল্যাণ করতে পারবেন—সেই পথেরই অভিযাত্রী আজ তিনি। মেয়ের হুমকিতে সে পথ ত্যাগ করে আসার মানুষ তিনি নন। প্রথম যৌবনে লক্ষ্য ছিল, বন্ধনদশা থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করবেন। বিদেশী শাসনভার থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করবেন দেশকে। একদল বিপ্লববাদীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ হয়েছিল তাঁর; তখন তিনি কলকাতায় মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ওঁর বাবা হঠাৎ টের পেয়ে গেলেন। পিতাপুত্রে একটা সম্মুখযুদ্ধ হবার উপক্রম হল। পরমানন্দের বাবা কলকাতার এই পরিবেশ থেকে ছেলেকে সরিয়ে নেবার জন্যই তাকে বিলাত পাঠালেন। খুশী হয়েছিলেন তাতে পরমানন্দ। দলপতি জ্যোতির্ময় পাঠক বলেছিলেন -এ শাপে বর হল, আমরা একটি বিশ্বস্ত লোককে ভারতের বাইরে পাঠাতে চাইছিলাম। ভালোই হবে—তোমাকে দিয়েই কাজটা হবে—অথচ খরচ দেবেন

তোমার বাবা। তারপর দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেল দেশের ইতিহাস। ভারতজোড়া বিপ্লবজাল মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পঞ্জাব থেকে চট্টগ্রাম—জাল গুটিয়ে অনেককেই ধরে ফেলল ওরা। কেউ মরল গুলি খেয়ে, কেউ ফাঁসির মঞ্চে। অত্যন্ত সুকৌশলে অতীত জীবনের ইতিহাসকে লুকিয়ে ফেললেন পরমানন্দ অপ্রকাশের অনালোকে। শতাব্দীর দীর্ঘ পঞ্চমাংশ তাঁর জীবনে রাজনীতির কোনও স্থান ছিল না। ছিল না প্রকাশ্যে—কিন্তু অন্তরের নিভৃতলোকে নিশ্চয়ই বয়ে চলেছিল বিদ্রোহের ফল্গুধারা। হঠাৎ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো একদিন পাষাণকারা ভেদ করে বের হয়ে এল সে। উপায় ছিল না। শচীশ নন্দীর ছেলের সন্ধান বলে দেওয়া অসম্ভব ছিল সেদিন তাঁর পক্ষে। পঁচিশ বছর আগে গীতা-হাতে দলপতি কাছে যে গোপনীয়তার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা ভাঙতে পারেন নি তিনি। কারারুদ্ধ ছিলেন দীর্ঘদিন। জীবনটাই কেটে যেত সেই অন্ধকারার অন্তরালে। অন্তত সেদিন মনে হয়েছিল, এটাই অনিবার্য নিয়তি। দেশ স্বাধীন না হলে এই পরিণতিই ছিল অবধারিত।

জেলে থাকতেই দুঃসংবাদটা পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ে তাঁকে কাবু করতে পারে নি—পুলিশী অত্যাচারে তিনি ভেঙে পড়েন নি—মাথা সোজা রেখেই গ্রহণ করেছিলেন মিস গ্রেহামের হার্টফেল করার সংবাদ। কিন্তু এ সংবাদটা বজ্রাঘাতের মতো দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাঁর অন্তঃকরণ!

অসীম শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল।

নীলাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন ননীমাধব। সে রাজী হয় নি। এ বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। মিস গ্রেহাম গত হয়েছেন, অসীম নেই, বাবা নেই, বৈশাখী কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। পুরনো আমলের লোক একমাত্র মাটি কামড়ে পড়ে আছে, নন্দ বেয়ারা। বোধকরি নিয়মমত মাহিনা না পেলেও সে চলে যেত না। দৈনন্দিন আহার না জুটলেও। এ বাড়ির অনেক সুখদুঃখের ইতিহাসে সে ছিল নীরব সাক্ষী। দিদিমনিকে সে ছেড়ে যায় নি।

নীলা অসীম ধৈর্যে নিজেকে সংহত করেছিল। অসীমের মৃত্যুর পর প্রথম কয়েক মাস সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সে নিজেকে সংযত করে তোলে। পড়াশুনা শুরু করে আবার। বাবা ফিবে আসবেন না—আর কেউ নেই তার। নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। ধাপে ধাপে পার হয়ে গেল কলেজের সোপানশ্রেণী। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্ধকারার অন্তরাল থেকে যেদিন বার হয়ে এলেন পরমানন্দ, সেদিন নীলাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে নীলার। দেহে এবং মনে। অনেক বড় হয়ে গেছে—অনেক ভাবিকে। বৃদ্ধ বাপকে সে ছোট্ট শিশুর মতোই টেনে নিল নিজ ক্রোড়ে।

তাঁর অবর্তমানে নীলার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পেয়েছিলেন নন্দ বেয়ারার কাছ থেকে, কিছুটা ননীমাধব অথবা দীপকের মারফত। নীলা ঘোর নাস্তিক হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আনন্দঘন কোনও সত্তার কথা সে স্বীকার করতে নারাজ। যে সর্বশক্তিময় সত্তা তার সুখের সংসারকে ছারখার করে দিয়েছে—তার বাপকে করেছে নির্যাতন - তার নিরপরাধ ভাইকে নিষ্ঠুর নিয়তির নিষ্পেষণে দলিত মথিত করে ঠেলে দিয়েছে অ ামাননাকর মৃত্যুর মুখে—তাঁকে মঙ্গলময় বলে স্বীকার করে না নীলা, করবে না কখনও।

কিন্তু পবমানন্দ তখন একটা অবলম্বন খুঁজছেন। জীবনের তিনপোয়া অংশে ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন বোধ করেন নি। তিনি থাকেন ভালো,—না থাকেন বয়ে গেল—ভাবটা ছিল এই। এখন কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে এসে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন তিনি। ফিরে এসে বুঝতে পেবেছিলেন, সংসারে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাঁর অবর্তমানে নার্সিং হোম উঠে যায় নি। ননীমাধবের তত্ত্বাবধানে সেটা চলছে ঠিকই। তাঁর নিজস্ব সংসারেও তিনি বাহুল্যমাত্র। শেয়ারের ডিভিডেণ্ড আর বাড়িভাড়া থেকে সংসার-যন্ত্রে ঠিকমতো রসদ যোগান দেয় নীলা। কোথাও সংসার তাঁকে

দেখে বললে না—এই যে, এসো। কোনও দায়ঝক্কি নেই বৃদ্ধের। সকালে খবরের কাগজ পড়তে পার, তুপুরে নিদ্রা যাও না কেন? বিকালে একটু সান্ধ্য ভ্রমণ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রাত্রে—না এই বয়সে বেশী রাত জাগা ভালো নয়—সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ো বরং। ব্যবস্থাটায় প্রথমে আহত বোধ করেছিলেন। তারপর মনে হল—এই তো তুনিয়া। একদিন তিনি ছিলেন এ সংসারের কেন্দ্রস্থলে—তিনিই ছিলেন এর কর্ণধার। তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে গড়ে উঠেছে নতুন ব্যবস্থা—এই তো স্বাভাবিক। আবার কেন সে নতুন ব্যবস্থায় আঘাত হানবেন উনি? পরমানন্দ অন্তরে অন্তরে বিদায় নিলেন সংসার থেকে।

এই সময়েই তিনি দীক্ষা নেন গুরুদেবের কাছে। উদাসীন সন্ন্যাসী মানুষ। সাক্ষাৎ পান হরিদ্বারের আশ্রমে। কোনও জাগতিক বন্ধন নেই। দৃষ্টি তাঁর কোন তুর্নিরীক্ষ দিগন্তে ফেরানো। তাঁর সঙ্গে কথা বলে অদ্ভুত সান্ত্বনা পেলেন পরমানন্দ—অভিভূত হয়ে পড়লেন। মনে হল ইনিই তাঁকে পথ দেখাবেন। গুরুদেবের উপদেশমতো সাধনমার্গের পথে শুরু হল তাঁর নূতন অভিযাত্রা। অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পেলেন তাঁরই প্রসাদে। নূতন লক্ষ্যের দিকে নূতনতম অভিযান। জানতে হবে তাঁকে—যাঁকে পাওয়ার পর অন্য সমস্ত পাওয়াকে মনে হয় তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। গুরুদেবের আশ্রম শহরের অপর প্রান্তে। গুটি তিন-চার অনুরাগী শিষ্য আছে—তাদের আছে অনুসন্ধিৎসা, আছে নিষ্ঠা—নেই আড়ম্বর, নেই উপকরণের বাহুল্য। সন্ধ্যাবেলা ওদের সঙ্গেই এসে বসতেন গুরুদেবের কাছে। বর্ষায় ও শীতে খড়ে-ছাওয়া মেটে ঘরের প্রদীপজ্বালা আধো-অন্ধকারে; অন্যান্য ঋতুতে বাগানের ছাতিমগাছ-তলায়। গুরুদেবের কণ্ঠে ছিল ঈশ্বরদত্ত মাধুর্য—গানই করুন, কথকতাই করুন, অথবা পাঠই করুন, গীতা অথবা উপনিষদ্—তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ত শ্রোতা। সংস্কৃতটা ভালো জানা নেই পরমানন্দের—তাই যখন ভাষ্য না করে শুধু ব্রহ্মসূত্র আওড়ে যেতেন, অর্থগ্রহণ হত না—কিন্তু অভিভূত হয়ে থাকতেন তখনও। ছন্নছাড়া

জীবনে শান্তি পেলেন তিনি।

নীলাকেও তিনি নিয়ে আসতে চাইতেন এই সুশান্ত পরিবেশে। পরমানন্দ জানতেন, নীলার মনের দুঃখের দাহন—তাই তাকেও আনতে ইচ্ছা হত সঙ্গে করে। নীলা রাজী হত না। এ নিয়ে মতান্তর হয়েছিল পিতাপুত্রীর, মনান্তর হতে পারে নি। কারণ সংসারের চতুঃসীমায় অপরের মতকে সহ্য করবার যে অলিখিত আইন ছিল, সেটা অতিক্রম করে নি কোনও পক্ষই। কালাপাহাড়-কন্যা ও প্রহ্লাদ-পিতার মধ্যে কোনও ফাটল দেখা দেয় নি এইজন্য। এই কারণে একজন অপরের সান্নিধ্য ত্যাগ করার কথা কল্পনা করেন নি।

দিন কেটে যায়।

হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করলেন পরমানন্দ-বানপ্রস্থ নেবার মতো মানসিক প্রস্তুতি হয় নি তাঁর। জাগতিক প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়ে যায় নি। কর্মযোগ ত্যাগ করে ভক্তিযোগে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টাটা তাঁর ঠিক হয় নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, সফল হয়েছে তাঁদের স্বপ্ন; কিন্তু কই, দেশজননীর অভাব অনটন তো দূর হয় নি। অনাহার, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা তো তেমন করেই চেপে ধরে আছে হতভাগ্য দেশের কণ্ঠনালী। তবে বৈরাগ্যসাধনের পথে কেন মুক্তির সন্ধানে তিনি মুমুক্ষু আজ? নানান প্রতিষ্ঠান থেকে এই নির্যাতিত দেশকর্মীটির আহ্বান আসতে শুরু করল। হিন্দু সংকার সমিতি হবে, মেয়েদের স্কুল হবে, হরিজন পল্লীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তি গাড়া হবে;—সবাই ডাকে পরমানন্দকে। তাঁর গলায় পরিয়ে দেয় ফুলের মালা—প্রশস্তি পড়ে শোনায়। তাঁকে পুরোভাগে রেখে চলতে চায় ওরা। এ আহ্বানকে তিনি উপেক্ষা করবেন কিসের জোরে? ক্রমে ক্রমে কখন বন্ধ হয়ে গেল গুরুদেবের আশ্রমে যাতায়াত—নিজের অজান্তেই নেমে এলেন তিনি সমাজসেবার কাজে,—সেখান থেকে আর এক ধাপ—সক্রিয় রাজনীতিতে।

এই সময়েই বার্টন অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানির একগোছা শেয়ার চলে এল তাঁর হাতে। পরমানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন শিল্পের উন্নয়ন না

করতে পারলে অর্থনৈতিক বন্ধনদশা ঘুচবে না দেশের। আত্মনিয়োগ করলেন তিনি শিল্পক্ষেত্রে। একনিষ্ঠ সেবায়, অনলস পরিশ্রমে অনতিবিলম্বেই অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। প্রতিষ্ঠা হল, শুধু নির্যাতিত দেশকর্মী বলে নয়—ভূতপূর্ব রাজবন্দী বলে নয়—প্রতিষ্ঠাবান শিল্পপতি বলে।

কিন্তু একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে—এটা ভুলতে পারেন নি। নীলাকে সংসারী করা হয় নি। বয়স হয়েছে মেয়ের—শিক্ষাও শেষ করেছে সে। মনোনীত পাত্রটি অবশ্য বরাবরই রয়েছে হাতের মুঠোয়। শুধু দু হাত এক করে দেওয়া। শুধু পরমানন্দ আর ননামাধবই নয়—নীলাও নিশ্চয় পছন্দ করে ওকে। না হলে এ দীর্ঘদিন ওর সঙ্গে কখনও এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশত না। বন্ধু বলতে একমাত্র সেই আসে নীলার কাছে।

কথাটা একদিন পাড়লেন তিনি। নীলা শুধু বললে—সে হবার নয়।

—হবার নয়! কেন? অমতটা কার? তোমার না দীপকের?

—ওটা অবান্তর প্রশ্ন। দীপক জানে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব।

এর পর দীপককেই প্রশ্নটা করতে হয়েছিল। স্পষ্টই তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন: তুমি কি নীলাকে যোগ্য মনে কর না?

জবাবে দীপক বলেছিল—নীলাকে অযোগ্য মনে করবে এমন পুরুষ মানুষ তো কই আজও নজরে পড়ল না। কিন্তু এ হবার নয় জ্যেঠামশাই।

—হবার নয়! কেন?

—কারণ নীলার মন অন্যত্র বাঁধা আছে।

পরমানন্দ চুপ করে গিয়েছিলেন। নীলার মন অন্যত্র বাঁধা আছে। অর্থাৎ নীলা অন্য একটি যুবকের প্রতি আসক্ত। কে সে? সমস্ত পরিচিত দুনিয়া তন্নতন্ন করে হাতড়াতে থাকেন। না, সম্ভাব্য কাউকেই মনে পড়ে না। কিন্তু তাই বা স্থিরনিশ্চয় হন কি করে তিনি? তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নীলা অতিবাহিত করেছে জীবনের রক্তধাতুর দিনগুলি। কে জানে, কোন রক্তিম ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে সেই

জীবনবসন্তে। পরমানন্দ কেমন করে জানবেন জীবনের কোন মধুপ এসেছিল গোপনে সে যৌবনের মৌবনে।

...আজ আর ওটা অজানা নয়! আজ তিনি জানতে পেরেছেন কার প্রত্যাশায় শবরীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল তাঁর আত্মজা; কিন্তু এ যে অসম্ভব আজ! ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলের সঙ্গে কুঁচবরণ রাজকন্যের বিবাহ হত যে যুগে তা গত হয়েছে ঘিয়ের প্রদীপজ্বলা সন্ধ্যাবেলা-গুলোর সঙ্গেই। মিরাক্ল-এর যুগ এ নয়। জীবনটা নাটক নয়—নভেল নয়। অসম্ভবের স্থান নেই জীবনে। আর সবচেয়ে বড় কথা তফাৎটা অর্থনৈতিক নয়—তা হলে সহজেই সমাধান করতে পারতেন, জাতের নয়—তাহলে উপেক্ষা করতেন। বাধাটা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, জীবনদর্শনে, বাধাটা নীতিগত। ওরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাসিন্দা। একজন কারখানার সর্বশক্তিমান ডিরেকটার-তনয়া—অন্যজন সেখানকার পদচ্যুত মেহনতী মানুষ—চুরির দায়ে যাকে বরখাস্ত করা হয়েছে!

ছি ছি ছি ছি!

পরমানন্দ প্রায় জোর করেই নেমে গেলেন মাঝপথে। ননীমাধবকে বললেন, তারিণীদার কাছে গিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতে। তিনি গুরুদেবের আশ্রমটা ঘুরে একটু পরেই আসবেন ওখানে। ননীমাধব প্রথমটা পীড়াপীড়ি করতে থাকেন সঙ্গে যাবার জন্য—কিন্তু একগুঁয়ে বন্ধুর প্রকৃতি তাঁর জানা ছিল ভালো রকমই। তাই শেষ পর্যন্ত বলেন—না হয় চলো তোমাকে আশ্রমে নামিয়ে দিয়ে যাই।

না, তাতেও আপত্তি পরমানন্দের। এটুকু পথ হেঁটেই যেতে পারবেন তিনি। অগত্যা পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা মেঠো রাস্তাটা যেখানে বাঁক ঘুরে যাত্রা করেছে ঐ নির্জন আশ্রমটির দিকে সেই পথের মোড়ে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে ওঁরা চলে যান।

মুক্তির নিঃশ্বাস পড়ে একটা। একটু নির্জন অবকাশই খুঁজছিলেন এই মুহূর্তটিতে। ভালোই হয়েছে। নীলা যদি এখানে এসে থাকে ভালোই—না হলেও দীর্ঘদিন পরে আজ গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা

করে মনটা হালকা করে নেবেন। এই শান্ত মনোরম বাতাবরণে মনটাকে স্নিগ্ধ করে নেবেন। নীলা কি এখানে এসেছে? সম্ভবত না। নীলা এখানে আসবার মেয়ে নয়। সে সহ্য করতে পারে না ওঁর গুরুদেবকে। একদিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রায় জোর করে ওকে নিয়ে এসেছিলেন গুরুদেবের কাছে। আশা করেছিলেন ওঁর প্রভাবে হয়তো অবিশ্বাসের অচলায়তন ভেঙে পড়বে নীলার। তা কিন্তু বাস্তবে হয় নি। রীতিমতো সমকক্ষের মতো তর্ক করেছিল নীলা, শুধু তর্ক নয়—খানিকটা উপেক্ষা, খানিকটা ব্যঙ্গও ছিল সেই তর্কের সঙ্গে। গুরুদেব অবশ্য কিছু মনে করেন নি—কিন্তু লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন পরমানন্দ।

বেলা বারোটা বাজে। অন্যমনস্ক হয়ে কাঁচা সড়কটা ধরে পায়ে পায়ে চলেছেন তিনি আশ্রমের দিকে। আশপাশে নজর পড়ল হঠাৎ। আশ্চর্য মিষ্টি লাগল পরিবেশটা। শহরতলীর মাধুর্যে মোহিত হয়ে গেলেন যেন।

স্তব্ধ মধ্যাহ্নের অভ্ররৌদ্র বন্দী হয়েছে ঘন কাঁঠালপাতার ঠাস-বুনানিতে—মাঝে মাঝে পথের ধূলায় পড়েছে পাতার ফাঁক দিয়ে চুরি-করে আসা টাকা-টাকা রোদের ছোপ। ধূলোর গন্ধ এসে মিশেছে বনতুলসীর সৌরভে। পথের ধারে নয়ানজুলিতে বদ্ধ জলের ঘিরে রঙের কাদায় গা এলিয়ে নিশ্চিত আবেশে পড়ে আছে একটা মিশকালো মোষ। রাস্তার ওধারে মেঠো ঘরে ঘুম নেমে আসছে কোনও দামাল ছেলের আধবোজা চোখের পাতায়—গাড় কালো নিথর ঘুম। ওর মায়ের সুরেলা কণ্ঠের ঘুমপাড়ানিয়ার সঙ্গে সঙ্গত জমিয়েছে বিরলপত্র বাবলা গাছের ঘুঘুটা।

এমন কিছু বিরলসন্ধান দুর্লভ দৃশ্য নয়। পথের ধারে এমনি করেই চিরকাল ফুটে থাকে এ-দৃশ্য শহরতলীর দেশে। তবু যেন হুহু করে উঠল ওঁর মনের মধ্যে। কেমন যেন বঞ্চিত মনে হল নিজেকে। কে যেন এই পল্লীর শান্ত দৃশ্যটিকে সরিয়ে রেখেছিল তাঁর দৃষ্টি থেকে। দ্রুতগতি মোটরের জানলায় এ দৃশ্য ধরা দেয় নি এতদিন তাঁর কাছে।

এতদিন উপকরণের দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন তিনি—ঐশ্বর্যের ঠুলি এঁটে দিয়েছিল কে যেন তার চোখ দুটিতে।

পায়ে পায়ে উনি এসে পৌছলেন আশ্রমে।

গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হল না কিন্তু। তিনি সকালের ট্রেনে কোথায় যেন চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারল না। যাবার আগে না কি একখানা চিঠি লিখে গেছেন পরমানন্দের নামে। চিঠিখানাও পেলেন না। সেখানা নিয়ে নাকি ছোট মহারাজ সকাল বেলাতেই বার হয়েছেন—তাঁকেই চিঠিখানা পৌছে দেবার জন্য। এখনও ফিরে আসেন নি।

পরমানন্দকে মৃগচর্মের একটি আসন এনে দিল আশ্রমের একটি ভৃত্য। গুরুদেবের সেবার জন্য তিনিই বাহাল করেছেন ছেলেটিকে—মাহিনাও তিনিই দেন। আর কেউ নেই আশ্রমে। উনি বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। যদি ফিরে আসেন ইতিমধ্যে ছোট মহারাজ।

সৌম্য শান্ত আশ্রমের বাতাস। ছোট্ট একটা বাগান পাঁচিল-ঘেরা আঙিনায়। হ্যাঁ, পাঁচিলটা তিনিই খরচ করে গেঁথে দিয়েছেন। সিমেণ্ট দিয়েই গেঁথে দেবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু কালো বাজার ছাড়া ও দ্রব্যটি পাওয়ার উপায় নেই। কারখানার এক্সটেনশনটার বেলায় যা করেছেন করেছেন—তাই বলে ঐ ভাবে জোগাড়-করা সিমেণ্ট দিয়ে তো তিনি আশ্রমের পাঁচিল গাঁথতে পারেন না। তাই চুন-সুরকি দিয়েই গেঁথে দিয়েছেন প্রাচীর। কি যেন ভাবছিলেন! হ্যাঁ, বাগান—সুন্দর ফুলের বাগান! পূজার ফুলের জন্য অসুবিধা হয় না আর গুরুদেবের।

বড্ড গরম লাগছে! বিজলী নেই আশ্রমে—সুতরাং ফ্যানও নেই। পরমানন্দ ইলেকট্রিক কনেকশন করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—কত আর খরচ হত? আর হত তো হত। পরমানন্দের মতো শিষ্য থাকতে গুরুদেব কষ্ট পাবেন গরমে?

কিন্তু গুরুদেবই রাজী হন নি।

পরমানন্দ খদ্দরের পাঞ্জাবিটা খুলে আরাম করে বসেন। এই আশ্রমেও আজকাল আর আসা হয়ে ওঠে না তাঁর। অথচ বছর

কয়েক আগে ঝড়বৃষ্টিমথিত কোনও একটি সন্ধ্যাবেলায় যদি এখানে না আসতে পারতেন, তো মনে হত একটি দিন বৃথা গেল। আর আজ বোধহয় কয়েক মাস পর আসছেন তিনি এ আশ্রমে। সরে গেছেন, উপকরণের দুর্গে বন্দী হয়ে পড়েছেন নিজের অজ্ঞাতেই। শেষ কবে এসেছিলেন এ আশ্রমে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে,—নমিনেশন যেদিন পেলেন সেদিন এসেছিলেন গুরুদেবকে প্রণাম করতে। মনে পড়ল সেদিনকার ঘটনাটা।

সেদিন নিভৃতেই পেয়েছিলেন গুরুদেবকে, জনান্তিক অবকাশে। সামনের ঐ যে তালাবন্ধ ঘরটা দেখা যাচ্ছে ঐখানে একটা প্রদীপ জ্বেলে বসে কি একখানা গ্রন্থ পড়ছিলেন তিনি। পরমানন্দ এসে বসলেন তাঁর পায়ের কাছে, প্রণাম করলেন। গ্রন্থখানি মুড়ে রেখে গুরুদেব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন শিষ্যের দিকে।

লজ্জিত বোধ করেছিলেন সেদিন সে-দৃষ্টির সামনে। নীরব দৃষ্টির জিজ্ঞাসা—কি ব্যাপার? দীর্ঘদিন পরে এমন হঠাৎ?

পরমানন্দ বলেছিলেন নমিনেশন তিনিই পেয়েছেন। এবার ভোটযুদ্ধে নেমে পড়বেন। তাই সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিতে যাবার আগে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছেন।

মনে আছে, গুরুদেব হেসে বলেছিলেন—হঠাৎ অ্যাসেম্‌ব্লিতে যেতে বাসনা হল যে?

সত্য কথাই স্বীকার করেছিলেন তিনি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিতে চান নিজ কর্মক্ষেত্র। এই শহরের ছোট গণ্ডীর চতুঃসীমায় তাঁর দেশসেবার ঐকান্তিকতাকে তিনি সীমিত হতে দেবেন না। সমগ্র দেশের ভালোমন্দ নির্ভর করে যে আইনসভার নির্দেশে, সেখানকার মণিকার হবেন তিনি—সে আহ্বান তিনি শুনতে পেয়েছেন—আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের নিমন্ত্রণ এসেছে—আরও বড় ধরনের কাজ!

—এখানকার কাজ কি তোমার শেষ হয়ে গেছে?

কি শিশুর মতো সরল প্রশ্ন! কাজের কি শেষ আছে, যে শেষ হবে? এখানকার কাজ তো আছেই—আরও গুরুতর কাজের মধ্যে

ডুবে থাকতে চান তিনি। কর্মযোগী পরমানন্দকে দেশ ডাকছে নির্দেশ দেবার জন্য, সে আমন্ত্রণ এসে পৌঁছেছে তাঁর কর্ণকুহরে। তাই রাজী হয়েছেন ইলেকশনে দাঁড়াতে। নূতন যাত্রাপথে অভিযাত্রার মঙ্গলমুহূর্তে তিনি উপদেশ নিতে এসেছেন গুরুদেবের পায়ের তলায় বসে।

উপদেশ দিয়েছিলেন গুরুদেব। কিন্তু খুব ভালো লাগে নি সেদিন কথাগুলি। বস্তুত তিনি আহতই হয়েছিলেন। কি ভাবেন আসলে গুরুদেব! হঠাৎ ও-কথা বললেন কেন? পরমানন্দের অন্তরবাসী নির্লিপ্ত ত্যাগব্রতীর স্বরূপটা কি গোপন রইল গুরুদেবের মর্মভেদী দৃষ্টিতেও—তিনি কি দেখলেন শুধু অহমিকায় ভরা মোহান্ধ একজন ক্ষমতালিপ্সু সাধারণ ভোগীকেই? সেদিন তিনি নীরবে উঠে গিয়েছিলেন প্রণাম সেরে—খানিকটা আহত হয়েই। আজ মনে হয়, কিছুটা প্রয়োজন বোধহয় ছিল তাঁর সেই উপাখ্যান পরিবেশনে। নীলাও তো ঐ একই কথা বলে গেল।

—স্বার্থ বলতে আমি স্থূল কিছু বোঝাতে চাইছি না বাবা। টাকা পয়সা বাড়ি-গাড়ি হচ্ছে স্থূল স্বার্থ—হয়তো সে লোভকে তুমি জয় করেছ—করেছ কিনা তা তুমিই জান! আমি 'স্বার্থ' শব্দটা অন্য অর্থে ব্যবহার করেছি। অপরের চোখে নিজেকে মহৎরূপে প্রতিপন্ন করাও স্বার্থেরই অভিব্যক্তি। প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, সুনাম—এগুলোও কি স্বার্থ নয়, অহমিকার প্রকাশ নয়?

গুরুদেবের কাহিনীটা আবার মনে করতে লাগলেন। না, ভোলেন নি তিনি। ভালো কথক ওঁর গুরুদেব। সামান্য উপাখ্যানও বাচন-ভঙ্গির গুণে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে ওঁর শ্রীমুখে। সেদিনকার গল্পটা মনে পড়েছে।

বলেছিলেন—প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। ফুল-ফল-পশু-পক্ষীতে সুন্দর সুষমায় পূর্ণ হয়ে উঠল সৃষ্টি। ক্রমে সৃজন করলেন মানুষ। ষোলো কলার ষোড়শ কলা যেন! নিপুণ চিত্রকর যেমন অনিমেশ নয়নে চেয়ে দেখে তার সন্ত-শেষ-করা আলেখ্য—তেমনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখলেন বিশ্বকর্মা

তাঁর সদ্যসমাপ্ত শিল্পকর্মের দিকে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। কী অপূর্ব তাঁর এ সৃষ্টি! তুষারশুভ্র ধ্যানস্তিমিত গিরিশৃঙ্গমালার স্তব্ধ গাম্ভীর্য, সমুদ্রমেখলা বেলাভূমির স্বর্ণসম্ভার, গহন অরণ্যের যোগমগ্নতা, মৌন শান্ত জনপদ—অপূর্ব, অপূর্ব! মানুষের মুখে মাধুর্য, বুকে স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা। মায়ের বুকে মধুক্ষরা স্নেহধরা, বাসরঘরের দ্বারপ্রান্তে নববধূর লজ্জাজড়িত চরণক্ষেপ, আর শিশুর নিষ্পাপ সরল দৃষ্টি! তাঁর সৃষ্ট জগৎ বুঝি স্বর্গকেও অতিক্রম করে গেছে! নিজের প্রভূত সাফল্যে বিশ্বকর্মার মনে দেখা দিল অহঙ্কার। মনে হল, যে শিল্পচাতুর্য তিনি দেখিয়েছেন তা বুঝি স্বয়ং পরিকল্পনাকার প্রজাপতি ব্রহ্মার কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেছে। জগৎ সৃষ্টির কাজ সুসম্পন্ন করার সংবাদ নিয়ে বিশ্বকর্মা এলেন ব্রহ্মলোকে—স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে।

ভগবান প্রজাপতি বললেন—সৃষ্টি শেষ হয়েছে?

করজোড়ে বিশ্বকর্মা নিবেদন করলেন—হ্যাঁ প্রভু। আমার শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণ থাকতে আমি কখনও তৃপ্ত হতে পারি না। কোথাও কোনও খুঁত রাখি নি আমি। শ্রেষ্ঠ সাধনায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। আমাকে আশীর্বাদ করুন।

ব্রহ্মা বললেন—মূঢ়! এত অল্পেই তোমার অহঙ্কার হয়েছে! মোহান্ধ হয়েছ বলে এতদূর থেকে ঐ শিল্পকর্মের দোষত্রুটি তোমার নজরে আসছে না, তাই ঐ পৃথিবীতেই তোমাকে নির্বাসিত করলাম। যাদের তুমি গড়েছ—তাদের মধ্যে গিয়ে এবার জন্ম নাও। তাদের জীবনের অপূর্ণতার বিষয়ে অবহিত হও—সেটা সংশোধনের চেষ্টা করো।

বিশ্বকর্মা মর্মাহত হলেন; আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, তা হলে কি কোন দিন আর স্বর্গরাজ্যে ফিরে আসতে পারব না?

—যেদিন 'অহং'-জ্ঞান থেকে তোমার মুক্তি হবে—যেদিন বুঝতে পারবে নিজের ক্ষমতার সীমানা আর জাগতিক দুঃখ অতিক্রমণের উপায়, সেদিন স্বর্গরাজ্যের দ্বারে এসে করাঘাত কোরো। আমি তোমায় পরীক্ষা করব। উত্তীর্ণ হলে ফিরে পাবে স্বর্গবাসের অধিকার।

নির্বাসিত হলেন বিশ্বকর্মা। জন্ম নিলেন সাধারণ মানুষের ঘরে।

দেখলেন তাঁর সৃষ্ট জগতে কোথায় কোথায় অপূর্ণতা রয়েছে। রোগ-শোক-মৃত্যুকে দেখলেন, লোভ-হিংসা-কামকে উপলব্ধি করলেন। সংসারের শত দুঃখকষ্টের মধ্যে জাগতিক যন্ত্রণার উপলব্ধি হল তাঁর। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল চাঁদের মতো সুন্দর, কাছে এসে দেখলেন সেটা সমতল নয় মোটেই—সেখানে আছে উবড়োখাবড়া গর্ত, প্রতি পদক্ষেপে—চাঁদের কলঙ্ক !

বিশ্বকর্মা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। কঠিন তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনে কঠিন তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন। দীর্ঘ তপস্যার পর উপলব্ধি হল—পরমব্রহ্মের পদে পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে পারলেই এগুলি থেকে মুক্তি সম্ভব।

ফিরে গেলেন তিনি স্বর্গদ্বারে। করাঘাত করলেন সিংহদরজায়। ভিতর থেকে প্রশ্ন হল—কে তুমি ?

বিশ্বকর্মা বললেন—আমি বিশ্বকর্মা, পৃথিবী সৃজন করেছি। আমার সে সৃষ্টিকার্যের অপূর্ণতার কথা আমি জানতে পেরেছি। সেই অপূর্ণতার হাত থেকে মুক্তির উপায়ও উপলব্ধি করেছি। দ্বার খুলুন প্রভু।

অবরুদ্ধ স্বর্গদ্বার উন্মোচিত হল না।

বিশ্বকর্মা বিস্মিত হলেন। নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে। উত্তীর্ণ হতে পারেন নি পরীক্ষায়। ফিরে এলেন তিনি। কঠিনতর তপস্যা করলেন। অন্নজল ত্যাগ করলেন—শুধু বায়ুভুক হয়ে সাধনায় মগ্ন রইলেন এক কল্পান্ত। ধীরে ধীরে নিজের ভ্রান্তি আবার অনুধাবন করলেন। হ্যাঁ, ভুলই হয়েছিল তাঁর। 'আমি পৃথিবী সৃজন করেছি' এ জ্ঞান তো তখনও ছিল। আমি কে ?

আবার ফিরে গেলেন স্বর্গের প্রবেশতোরণে। করাঘাত করলেন দ্বারে।

ভিতর থেকে প্রশ্ন হল—কে এসেছ ?

বিশ্বকর্মা বললেন : আমি বিশ্বকর্মা—আপনি আমাকে নিমিত্ত মাত্র করে যে পৃথিবী সৃজন করেছেন—তার ভিতর আমার ভুলে কিছু

ত্রুটি রয়ে গেছে। তাই আমার দোষে আমার সৃষ্ট জগতে দেখে এলাম রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর যন্ত্রণা। কিন্তু সে যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথের সন্ধান আমি পেয়েছি প্রভু। দ্বার খুলুন।

দ্বার অবরুদ্ধই রইল।

স্তম্ভিত হলেন বিশ্বকর্মা। এ কী! এখনও কি পূর্ণজ্ঞান হয় নি তাঁর? ফিরে এলেন মর্ত্যে। এরপর যে তপশ্চর্যা করলেন তার আর তুলনা নেই। বায়ু পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। নির্বিকল্প সমাধিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন যুগযুগান্ত। কঠিনতম যোগাভ্যাসে জ্ঞানমার্গের শিখরচূড়ায় উঠলেন অবশেষে। বুঝলেন, কোথায় ভুল হচ্ছিল। যে জাগতিক দুঃখকষ্টকে তাঁর শিল্পকর্মের ত্রুটি বলে মনে হয়েছিল—আসলে তা-ও বিশ্বনিয়ন্তার সুপরিকল্পিত জগৎব্যবস্থার একটি পর্যায়। মায়ায় বদ্ধ মানুষ, অহংবোধের বেড়াজালে আবদ্ধ জীব, এগুলিকে দুঃখকষ্ট বলে মনে করে মাত্র। অসীম নিয়ে যাঁর কারবার তাঁর হিসাবে লাভও নেই, লোকসানই নেই—না যোগ, না বিয়োগ—কিছুতেই তাঁর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। পূর্ণের পুঁজি থেকে গোটা পূর্ণ বিয়োগ দিয়ে দিলেও নেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকবে। তিনি বুঝলেন শুধু আনন্দই আছে— আর কিছু নাই। তবে সে আনন্দের মূল উৎস—সেই সচ্চিদানন্দই!

বিশ্বকর্মা এবার দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে এসে দাঁড়ালেন স্বর্গদ্বারে। করাঘাত করামাত্র ভিতর থেকে অর্গল মোচনের শব্দ শোনা গেল। আশান্বিত হলেন বিশ্বকর্মা। দ্বার কিন্তু খুলল না; ভিতর থেকে প্রশ্ন হল— কে এসেছ?

—আমি বিশ্বকর্মা! প্রভু, আমি মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছি। এবার আর কোনও ভুল নাই। শুনুন—

সশব্দে অর্গল পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল। দূরে মিলিয়ে গেল কার যেন পদধ্বনি। বিশ্বকর্মার বক্তব্য পর্যন্ত শুনলেন না এবার প্রজাপতি ব্রহ্মা!

পরমানন্দ আর স্থির থাকতে পারেন নি। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কেন? এবার কী ভুল হল বিশ্বকর্মার?

হেসে বক্তা বললেন—সেই কথাই ভাবলেন বিশ্বকর্মা। কোথায়

ভুল হচ্ছে? কেন প্রশ্নের সমাধান পর্যন্ত শুনতে রাজী হলেন না প্রজাপতি ব্রহ্মা? ধীরে ধীরে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একখানি হাসি ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। পুনরায় আঘাত করলেন তিনি দ্বারে।

যথানিয়মে ভিতর থেকে প্রশ্ন হল: কে এসেছ?

বিশ্বকর্মা হেসে বললেন: প্রভু। তুমি এসেছ!

আর কিছু বলতে হল না। দ্বার খুলে গেল!

পরমানন্দ ব্যগ্র উদ্দীপ্ত দু চোখ মেলে বসে থাকেন।

গুরুদেব বলেন: পরমানন্দ, এই হচ্ছে অহং থেকে মুক্তি। বিশ্বকর্মা শেষ পর্যায়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি উপলক্ষ্য মাত্র, তিনি অতি অকিঞ্চিৎকর, সমস্তই সেই অনাদি-অনন্তের লীলা। এ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সাফল্যেও তাঁর কৃতিত্ব নেই—এর আপাত দোষত্রুটিতেও নেই তাঁর লজ্জিত হবার কোনও কারণ। এ পর্যন্ত তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন—বাকি ছিল এটুকু বোঝা যে, তিনি নিজেও ঐ সৃষ্টিকর্তারই একটি শিল্পকর্ম। তিনিও এ জগৎব্যাপারের একটি নিমিত্তরূপে সৃষ্ট হয়েছেন ঐ প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায়। তিনিও তাই তাঁরই অংশ। তাই যখন 'আমি এসেছি' এ ভ্রান্তি পর্যন্ত অপনোদিত হল—তখনই তিনি স্বর্গ-রাজ্যে ফিরে যাবার অধিকার পেলেন।

পরমানন্দ, এই হচ্ছে জ্ঞানযোগীর শেষ শিক্ষা। এই হচ্ছে অহং-জ্ঞান থেকে প্রকৃত মুক্তি!

—সাহেব।

তন্দ্রার ঘোর থেকে জেগে ওঠেন যেন পরমানন্দ: কে?

—এটা খেয়ে নিন স্যার!

—কি ওটা?

—ডাবের জল।

আশ্রমের যে ভৃত্যটি ওঁকে মৃগচর্মের আসনে সমাদর করে বসিয়েছিল, মাসান্তে যে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যায় মাহিনা, সেই ছেলেটিই নিয়ে

এসেছে কালো একটি পাথরের গেলাসে ডাবের জল। অত্যন্ত তৃষ্ণা পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওটা গ্রহণ করেন। পানীয়টিতে শরীর শীতল হল।

হঠাৎ হাসি পেল পরমানন্দের। তাঁর পরিধানে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি—পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি—মৃগচর্মের আসনে তিনি বসে আছেন এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। তবু তাঁর পরিচয় হল 'সাহেব', 'স্যার'। উপকরণের যে দুর্গে তিনি বন্দী হয়ে আছেন এত সহজে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। শুধু বাইরের খোলসটাকে বদলালে যে কোনও লাভ হবে না—এই শিক্ষাই যেন দিতে এসেছিল ঐ চাকরটি, একগ্লাস ডাবের জল নিয়ে। যাঁর আশ্রমে এসে বসে আছেন এ তাঁরই সংঘটন। আনন্দস্বরূপ মাধবের পায়ে পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে হবে—অহংজ্ঞান থেকে মুক্ত হতে হবে একেবারে ঐ বিশ্বকর্মার মতোই। না হলে মুক্তি নেই!

আশ্রমের ভৃত্যটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ছোট মহারাজ কখন বেরিয়েছেন?

—ঠাকুর দিদিমণিকে নিয়ে রওনা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি বেরিয়েছেন স্যার।

—দিদিমণি! কোন দিদিমণি?

—কেন, আমাদের দিদিমণি - নীলা দিদিমণি। কাল রাতে তো তিনি এখানেই ছিলেন। আজ খুব ভোরে উঠে ঠাকুরের সঙ্গে কোথায় চলে গেলেন।

—নীলা কাল রাত্রে এখানে ছিল! আজ সকালে উঠে চলে গেছে গুরুদেবের সঙ্গে! কোথায় গেছে?

—তা তো জানি না স্যার। ছোট মহারাজ জানেন। সেই তো চিঠি নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি—আপনার ওখানেই গেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন পরমানন্দ। বুকের একটা পাষাণ-ভার নেমে গেল। যাক, মেয়েটা তাহলে ওখানে যায় নি। তা কি যেতে পারে! হাজার হোক তাঁরই মেয়ে তো। মুখে গরম গরম

বললেও সত্যিই কখনও লজ্জার মাথা খেয়ে ঐ চোর-মাতাল-বদমায়েশ-গুলোর আড্ডায় গিয়ে রাত্রিযাপন করতে পারে ?

—কাল রাত্রে সে কোন ঘরে ছিল ?

চাকরটি ওঁকে নিয়ে যায় গুরুদেবের পাশের ঘরটিতে। ছোট্ট একখানি ঘর। একপাশে একটি চৌকি পাতা। গদি-তোশক নেই, শুধু সতরঞ্চির উপর একটি সাদা চাদর পাতা। খেয়াল হল গদির কথা, যখন অন্যমনস্কের মতো বসলেন চৌকিটাতে। বালিশটার মাঝখানে একটু বসে গেছে। কোলে তুলে নিলেন সেটা— মাথার তেলের একটি মৃদু সৌরভ। বিছানায় পড়ে রয়েছে একটা লোহার কাঁটা। খোঁপায় গোঁজার মাথার কাঁটা। তুলে নিয়ে বুক পকেটে রাখেন সেটাকে। অনেকদিন আগে তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে রাত্রিবাস করতেন। এ ঘরেই থাকতেন তিনি তখন। চাকরটাকে বললেন : এ ঘরে গদি-আঁটা যে পালঙ্কটা ছিল—সেটা কোথায় ?

—গুদামঘরে আছে স্যার !

—ও !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আশ্চর্য ! নীলা শেষ পর্যন্ত কাল রাত্রে আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ! এ কথা তো কল্পনাও করেন নি তিনি। কি করে করবেন—তিনি তো জানতেন, গুরুদেবকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না নীলা। ঈশ্বরবিশ্বাসী ঐ উদাসীনের প্রতি তার ছিল একটি তীব্র অনীহা। একবার জোর করে মেয়েকে আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। নীলা আসতে চায় নি, তিনিই বলে-কয়ে রাজী করিয়েছিলেন। নাস্তিক কন্যাটিকে সাধুসঙ্গে সংশোধিত করতে চেয়েছিলেন। লাভ হয় নি। সে এসে মুখে মুখে তর্ক করেছিল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

—আপনি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন ?

—না মা !

—তবে যাকে জানেন না, যাকে উপলব্ধি করেন নি, তার কথা পাঁচজনকে বলেন কেন ? যা আছে কি নেই—তা আপনি নিজেই

জানতে পারেন নি—তার দিকে লোককে আকৃষ্ট করেন আপনি কোন অধিকারে?

আমি তাঁকে পাই নি; কিন্তু তিনি তো অলভ্য নন। তাঁকে পাওয়া যায়।

—কেমন করে জানলেন?

—এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি তাঁকে উপলব্ধি করেছেন। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের স্বরূপ সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অনুভব করেছেন।

—কে সে? উদাহরণ দিন।

—আমাদের দেশের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা তাঁকে জেনেছিলেন, মা। যাঁরা উপনিষদের সামগান গেয়ে গেছেন সেই দ্রষ্টা আর্যঋষিরা। যাঁরা বলতে পেরেছিলেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

—আর আমি যদি বলি, তাঁরাও প্রকৃত সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানতে পারেন নি? যদি বলি, তাঁরা দল ভারী করবার উদ্দেশ্যে অনৃতভাষণ করেছিলেন।

শিউরে উঠেছিলেন পরমানন্দ। এ কী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করল নীলা, তর্কের ঝোঁকে। উদাসীন সন্ন্যাসী কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত হন না; বলেন—তোমার এ কথা মনে হওয়ার হেতু?

—হেতু এই যে, ঐ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরাই বলেছেন 'যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনোমতম্'—মন দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। বলেছেন 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ, ন বিদ্ম ন বিজানীমো'—তিনি অজ্ঞেয়, তিনি অবাঙ্‌মানসগোচর—সুতরাং হঠাৎ ভেলকি লাগাবার জন্য উপনিষদ্‌কার যদি বলে বসেন 'বেদাহমেতং'—তা তো আমি মেনে নেব না। আমি তাঁকে প্রশ্ন করব—কোনটা মিথ্যা আর কোনটা সত্য?

—দুটোই সত্য নীলা। দুটোই আপেক্ষিক সত্য। একটি সত্য তোমার আমার প্রতি প্রযোজ্য—যারা সাধনার শেষ সোপান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি, তাদের কাছে তিনি 'যন্মনসা ন মনুতে' আবার আর্যঋষিদের কাছে···

বাধা দিয়ে নীলা বলেছিল : সত্য আপেক্ষিক জাগতিক বিষয়-বস্তুর। যেখানে বিচার্য বিষয় নিত্যসত্য—সেখানে আপেক্ষিকতার প্রশ্ন আসে না। যিনি অমৃতের পুত্রদের ডেকে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন—তোমরা শোনো, আমি তাঁকে জেনেছি, তাঁর নাগাল পেলে তাঁরই তৈরী কেনোপনিষদের আর একটি মন্ত্র তাঁকে আমি শোনাতাম—'যদি মন্যসে সুবেদতি—দভ্রমেবাপি, নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম্। যদস্য ত্বং যদস্য, দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥' তুমি যদি মনে কর যে আমি তাঁকে জেনেছি—তাহলে আমি বলব সে জ্ঞান তোমার দভ্র—অল্পমাত্র ; কারণ ব্রহ্মের যে রূপ উপলব্ধিগোচর তা সামান্যতম অংশমাত্র—অতএব তোমার ব্রহ্মজ্ঞান, যা নিয়ে তুমি 'বেদাহমেতং' বলে বড়াই করছ, তাও মীমাংসার অপেক্ষা রাখে।

নীলার সামনেই পরমানন্দ গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন : অপরাধটা আমারই। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি ও এসে এভাবে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে বসবে। আমি বুঝতে পারি নি যে, আপনার উপদেশ শুনতে আসার যোগ্যতাও অর্জন করে নি নীলা।

গুরুদেব হেসে বলেছিলেন—তুমি ভুল করছ পরমানন্দ। নীলা তোমার চেয়েও আর এক ধাপ এগিয়ে আছে সাধনমার্গে। ওর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে চৌম্বকবৃত্তি। যে আকর্ষণে জীবাত্মা ছুটে যায় পরমাত্মার দিকে, সেই শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে ওর অন্তরে—শুধুমাত্র বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে চুম্বকখণ্ড। একদিন নেমে আসবে চরম আঘাত—দিক পরিবর্তন করবে ওর মনের চুম্বক—বিকর্ষণ পরিণত হবে আকর্ষণে। সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষাতেই আমি প্রহর গুনব নীলা-মা। তাই আজ তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

নীলার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে অপ্রত্যয়ের এক চিলতে হাসি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কি? হাতদুটি এক করে সে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ায়। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে না।

গুরুদেব বলেছিলেন—আর কিছু বলবে আমায়?

—বলব। শুধু বলব, 'নেদং যদিদমুপাসতে !'

মাটির সঙ্গে লজ্জায় মিশে গিয়েছিলেন পরমানন্দ, বিদ্রোহী আত্মজার এই স্পর্ধায়।

গুরুদেব এবারও হেসে প্রত্যুত্তর করেছিলেন—আর আমি বলব :

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥

দুঃখের আগুনে আমাদের অন্তরের সমস্ত কলুষ তুমি পুড়িয়ে ছাই করে দাও, হে অগ্নিদেব। আমাদের কুটিল মনের সমস্ত পাপের সন্ধানই তো তুমি জান—এ থেকে আমাদের তুমি মুক্ত করো—তোমাকে আমরা বারংবার প্রণাম করছি।

যুক্ত কর তিনি ললাটে স্পর্শ করেছিলেন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে।

সেই নীলা কি শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছে আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ? চরম আঘাতটা সে পেল কখন—না হলে চুম্বকখণ্ড দিক পরিবর্তন করে কেমন করে ? কোন দুঃখের আগুনে ওর অন্তঃকরণের সমস্ত কুটিল পাপ পুড়ে ছাই হয়ে গেল ?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। না, আর অপেক্ষা করা চলে না। বেলা একটা বাজে। উঠলেন। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে আবার নেমে পড়লেন রৌদ্রদীপ্ত পথে। বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে তাঁকে। ছোট মহারাজের সঙ্গে এই মুহূর্তে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন।

খর রৌদ্রের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মেজাজটা আবার বিগড়ে গেল। কি ক্লান্তিকর এই পথটা। এখনও হয়তো বাবলা গাছের ঘুঘুটা চুপ করে নি—মেঠো ঘরের ঘুমপাড়ানিয়ার রেশ নিঃশেষিত হয় নি স্তব্ধ মধ্যাহ্নের অনলবর্ষী আকাশে বাতাসে। মিশকালো মোষটা তখনও পড়ে ছিল গা এলিয়ে নয়নজুলির ঘিয়ে রঙের কাদায়। পরমানন্দের কিন্তু দৃষ্টিগোচরে এল না এ-সব। মিহি খদ্দরের সুবাসিত রুমাল দিয়ে

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কাঁচা পথটা পার হয়ে এসে উঠলেন পিচগলা বড় রাস্তায়।

—এই রিকশা!

বাঁচা গেল। আর হাঁটতে হবে না তাহলে। বাড়িই ফিরে চললেন অবশেষে।

একটা কথা তাঁর বার বার মনে হচ্ছে আজকে। রিকশায় বসে কথাটা ভালো করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন। দুর্লভ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। যাতে হাত দিয়েছেন—সোনা ফলিয়ে ছেড়েছেন। অদ্ভুত দৃঢ়তাও ছিল তাঁর চরিত্রে। যা ভালো বুঝেছেন তাই করে এসেছেন আজীবন। কিন্তু তবু—নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁকি ছিল। নিশ্চয়ই নিষ্ঠার অভাব ছিল তাঁর। এতদিন মনকে বলে এসেছেন—পেয়েছি! পেয়েছি! যা পেতে চেয়েছি জীবনে তা লাভ না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হই নি কোনদিন!···আজ হঠাৎ মনে হল সত্যিই কি তাই?—কী পেয়েছেন তিনি? কিছুই তো পাওয়া হয় নি। প্রথম যৌবনে মিশেছিলেন বিপ্লবীদের দলে—দেশোদ্ধারের মহান উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প করেছিলেন; কিন্তু কি হল? প্রবাসে গিয়ে সে পথ ছাড়তে বাধ্য হলেন। শল্য-চিকিৎসার ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলেন ভালোমানুষের মতো। তারপর স্থির করলেন রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে চলবেন জীবনে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে রীতিমত সংসারী হবেন তিনি। দেশের সেবা করবেন—আরোগ্য-নিকেতনে। রোগীর রোগমুক্তিতে, আর্তের সেবায় তৃপ্ত হবে তাঁর দেশসেবার কামনা। মিস গ্রেহাম আর অ্যানির সাহচর্যে গড়ে তুললেন এক অপরূপ আরোগ্য-নিকেতন। বুকের পাঁজরের চেয়েও ভালোবাসলেন তাকে। প্রতিজ্ঞা করলেন—এই হবে তাঁর স্বপ্ন, সাধনা! পারলেন? এখানেও ব্যর্থ হলেন তিনি। আরোগ্য-নিকেতন আজ কোম্পানীর সম্পত্তি। নার্সিং হোম আজও আছে, কিন্তু তাঁর স্বপ্নসাধনার শেষবিন্দু পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। রাজনীতিকে পরিহার করবার সঙ্কল্পও রক্ষিত হল না। কারাজীবন শেষ করে এসে স্থির করলেন ধর্মকর্মে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবেন।

মেতে রইলেন কিছুদিন গুরুদেব আর তাঁর আশ্রম নিয়ে। কিন্তু টিকে থাকতে পারলেন না। ফিরে যেতে হল কর্মক্ষেত্রে—রাজনৈতিক চক্রে। এখন তিনি পুরোপুরি ভোগী। মুখে বলেন বটে যে দেশসেবাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য—কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই !

পূর্বপক্ষের জবাব দিতে উত্তরপক্ষ উঠে বসল কোমর বেঁধে ওঁর মনের মধ্যে।

—কেন নয় ? এই যে দিনের মধ্যে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়—এর কী উদ্দেশ্য ? কেন তিনি যুক্ত আছেন বার্টন অ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানীর সঙ্গে ? ডিভিডেণ্ডের লোভে ? এককালে ম্যানেজিং এজেন্সি হাতে আসবে এই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে ? তা তো নয়। তিনি চাইছেন এটাকে একটা আদর্শ কারখানাতে রূপান্তরিত করতে। কুলি-ব্যারাকে ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা আছে কটা ফ্যাকটরিতে ? কিন্তু আছে সে ব্যবস্থা ওঁদের এখানে। তিনিই এটা বাধ্য করেছিলেন বোর্ড'ক মেনে নিতে। ওদের চীপ ক্যান্টিনটাও তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। কোম্পানি সাবসিডি দেয় ক্যান্টিনকে। কেন দেয় ? কে সে ব্যবস্থা করেছে ? মনে পড়ছে, ঐ স্বল্পমূল্যের ক্যান্টিনটি যেদিন খোলা হয় সেদিন অনেক বড় বড় লোক এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। ক্যান্টিনের সঙ্গে ক্লাবঘরও আছে—সেখানে আছে রেডিও, সংবাদপত্র, নানা রকম খেলার সরঞ্জাম, ব্যায়ামাগার। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অভ্যাগতরা। এমন কুলি-ব্যারাক সত্যই দেখা যায় না কোথাও। ঝকমক করছে পরিষ্কার পাকা রাস্তা, পাকা নর্দমা, রাস্তায় বিজলীবাতি—ক্লাবঘরে শ্রমিকেরা ক্যারাম খেলছে, তাশ খেলছে; ঢোল, খঞ্জনি, করতাল দেওয়া হয়েছে ওদের। ব্যায়মাগারে ব্যায়াম করছে স্বাস্থ্যবান শ্রমিকেরা। সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সেদিন পরমানন্দকে—তিনিই এ-সব করিয়েছেন কোম্পানিকে দিয়ে। যারা এ কারখানার প্রাণ সেই মেহনতী মানুষরাই যদি ভালোভাবে না বাঁচতে পারল তবে কী দেশের সেবা করছেন তিনি, এ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ?

সেই দেশসেবাকেই বিস্তৃততর করে দেবেন তিনি অ্যাসেম্ব্লিতে গিয়ে—এই ছিল কামনা।

মনে আছে, নীলা এই সেদিন বলেছিল—আচ্ছা বাবা, তুমি তো সারাদিন খদ্দর পর না, তাহলে মীটিঙে যাবার সময় এগুলি বার করে পর কেন?

রুক্ষস্বরে উনি প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন : কেন, তাতে কি হয়েছে?

—তুমি কি এটাকে একটা অন্যায় মনে কর না? এটা কি একটা লোকদেখানো 'শো' নয়?

—না, নয়! যুদ্ধক্ষেত্রে ইউনিফর্ম পরতে হয় বলে সৈনিকেরা কিছু গার্হস্থ্য জীবনেও ইউনিফর্ম পরে থাকে না। বিচারালয়ে গাউন আর হুইগ পরতে হয় বলে সারাদিন সেটা পরিধান করে থাকার কোনও যুক্তি নেই।

রিকশখানা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় ওঁর বাড়ির সামনে। নন্দ বেয়ারা ছুটে আসে কাছে।

—আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?

—হ্যাঁ স্যার, আশ্রম থেকে ছোট মহারাজ এসেছিলেন। তা আমি বললাম, আপনি কাকাবাবুর গাড়িতে বেরিয়েছেন—শুনে উনি সেখানেই গেলেন।

—সেখানে মানে?

—কাকাবাবুর বাসায়।

—হুঁ! একখানা চিঠি রেখে গেছেন কি?

—আজ্ঞে না।

—ইডিয়ট!

নন্দ চমকে ওঠে। বুঝতে পারে না, গালাগালটা কার উপর বর্ষিত হল। পরমানন্দ রিকশাওয়ালাকে বলেন : ঘোরাও!

—আপনার লাঞ্চ? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে নন্দ।

—ছোট মহারাজ যদি আবার আসেন তবে চিঠিখানা চেয়ে রাখিস।

—রাখব স্যার। আপনি খেয়ে যাবেন না?

—না, চলো।

রিকশা বেরিয়ে এল আবার রাস্তায়। চলল ননীমাধবের বাড়ির দিকে। হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন। ছুটো পাঁচ। আশ্চর্য! এখনও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না মেয়েটার! কালরাত্রে সে আশ্রমে ছিল—কতকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আজ সকালে উঠে কোথায় গেল? আত্মীয়বন্ধু কারও কথা মনে পড়ল না যেখানে গিয়ে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে পারে নীলা। এক ছিল ননীমাধবের বাড়ি। কিন্তু সেখানে সে যায় নি। গেলে উনি সংবাদ পেতেন।

…হ্যাঁ, আর একটা সম্ভাবনা আছে। পি-নাইন ব্যারাক। কথাটা মনে হতেই আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে ওঁর। মনে পড়ে গেল সেই উদ্ধত ছেলেটির বিদ্রোহী মূর্তি। একমাথা রুক্ষ চুল। পরিধানে একটা নীল পায়জামা। চেককাটা একটা হাফশার্ট গায়ে—কাঁধের কাছে ফেঁসে গেছে। শার্টের নিচে যে গেঞ্জি নেই—তা বোঝা যায় ঐ ছিন্ন অংশটা দিয়ে। চেককাটা হ্যাণ্ডলুমের সস্তা কামিজটায় লেগেছে ছোপ-ছোপ মবিল কিংবা গ্রীজ—চটচট করছে সেটা। এক-মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ছু হাতে ময়লা।

অফিসঘরে ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ঐ অপরূপ মূর্তিটা।

—কাল আমার গাড়ি আটক করে কি বলতে চেয়েছিলেন?

লোকটা চেপে বসে ভিজিটার্স চেয়ারে। আশ্চর্য সাহস তো! উনি ইচ্ছা করেই 'আপনি' বলে কথা বলেছিলেন। সম্মান দেখাতে নয়—কারখানার কোনও মেহনতী মানুষের সঙ্গেই এ ভাষায় তিনি কথা বলেন না। লোকটা যদিও পদচ্যুত কর্মী, কারখানার মজুর আর সে নয়; কিন্তু সেজন্যও 'আপনি' বলে কথা শুরু করেন নি তিনি। তিনি শুধু একটা দূরত্ব রাখতে চেয়েছিলেন মাত্র—পাছে 'তুমি' বলে কথা বললে সে পূর্বপরিচয়সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। লোকটা এই সুযোগে অম্লান বদনে বসে পড়ল সামনের চেয়ারে। বসে যখন পড়েইছে তখন আর উঠতে বলা যায় না।

—আমার উপর অবিচার করা হয়েছে। তাই আপনার কাছে

আমি সুবিচার চাইতে এসেছি। আমাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে অন্যায়ভাবে।

না। তোমার কেসটা আমি নিজে দেখেছি। এ অপরাধে কর্মীকে পদচ্যুত না করলে কারখানা চালানো যায় না। তোমার বিরুদ্ধে চুরির চার্জ আছে—এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

—আপনি এটা বিশ্বাস করেন?

—আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। মেশিন পার্টসগুলো তোমার ঘর সার্চ করবার সময় পাওয়া গেছে। অন্তত দশ-পনেরো জন সাক্ষী ছিল সার্চ করার সময়। অন্য কেউ চুরি করে তোমার ঘরে ওভাবে সেগুলি লুকিয়ে রাখতে যাবে কেন? এর চেয়ে ডাইরেক্ট এভিডেন্স আর কি হতে পারে?

—এভিডেন্সের কথা হচ্ছে না। আমার প্রশ্ন, আপনি এটা অন্তর থেকে বিশ্বাস করছেন কিনা? আপনি আমার পূর্ব-ইতিহাস জানেন—তাই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব?

—করি। বিশ্বাস করি। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' কথাটার তুমি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

—শুধু অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয় না ডক্টর চৌধুরী—প্রাচুর্যেও সেটা নষ্ট হয়ে থাকে—তারও উজ্জ্বলতম প্রমাণ আমি দেখাতে পারি। কিন্তু সে কথা যাক। আমি বলছিলাম—যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই চুরির কেসটা সাজিয়েছেন সে উদ্দেশ্য কিন্তু এতে সিদ্ধ হবে না।

—তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে আশা করি। তুমি যেতে পার।

—না, হয় নি। আমি শেষবারের মতো আপনাকে জানাতে এসেছি আমাদের মাথায় পা দিয়ে এভাবে চিরকাল আপনারা চলতে পারবেন না। আমাকে আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, কারখানা থেকেও কৌশলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন আপনি। কারখানার আপনি মালিক, আমাকে যে কোনও অজুহাতে আপনি তাড়াতে পারেন, কিন্তু তা হলেও এ শহর ছেড়ে আমি চলে যাব না। এতে

আপনার এবং আপনার বন্ধুর কারও উদ্দেশ্যই সফল হবে না।

ওর দুর্জয় স্পর্ধা দেখে মনে মনে হেসেছিলেন। মুখে বলেছিলেন —তাই না কি? তা কে আমার বন্ধু? আর আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যই বা কি?

—আপনার বন্ধু ননীমাধব মনে করেছেন আমাকে তাড়াতে পারলে মজদুর ঐক্য ভেঙে পড়বে—ইউনিয়ন গঠনের দাবিটা চাপা দিতে পারবেন। আর আপনি ভেবেছেন আমাকে আপনার কন্যার চোখের আড়ালে—

—শাট আপ! য়ু স্কাউণ্ড্রেল! বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে।

—যাচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই আপনাকে। বিদ্রোহী মজদুরই বলুন আর বিদ্রোহী আত্মজাই বলুন—মিটমাট করবার দিন আপনাকে ফিরে ডাকতে হবে এই অরুণাভ নন্দীকেই।

ইলেকট্রিক কলিং বেলটার গলা টিপে ধরেছিলেন পরমানন্দ। একটানা আর্তনাদ করে চলেছিল কলিং বেলটা—মৃত্যুযন্ত্রণায়। এক সঙ্গে তিনজন বেয়ারা এসে ঢুকল ঘরে—সাহেবের খিদমত করতে। ওরা এসে দেখে সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সুইং ডোরটার দিকে। ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাউপাতার মতো কাঁপছে সেটা। আর কেউ নেই ঘরে।

ঐ হতভাগাটার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে নীলা! এ কি বিশ্বাস্য?

ননীমাধবের বাড়িতে এসে দেখেন গৃহকর্তা তখনও ফিরে আসেন নি। দীপক ছিল। সে বলে—এ কি, আপনি? একা?

—হ্যাঁ, ছোট মহারাজ এসেছিলেন আমার খোঁজে?

দীপকের কাছে জানা গেল তিনি এখানেও এসেছিলেন পরমানন্দের সন্ধানে, দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন। চিঠি? না কোনও চিঠি রেখে যান নি।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। সকাল থেকে পাগলের মতো কেবল ছোটাছুটিই করে বেড়াচ্ছেন। একটা সোফায় গা এলিয়ে

দিয়ে বসে পড়েন : তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, বোসো।

সামনের সোফাটায় বসে দীপক প্রতিপ্রশ্ন করে—আপনার আহারাদি হয়েছে তো ?

—না, এবার বাড়ি গিয়ে খাব।

—সে কি, তারিণীদার ওখানে না আজ আপনার মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা ? বাবা তো তাই বলে গেলেন ?

ঠিক কথা। মনে পড়ে গেল পরমানন্দের। বাড়িতে সে কথা বলতে ভুলে গেছেন। দীপককে বলেন—তুমি তারিণীদাকে একটু ফোন করে জানিয়ে দিও—একটা বিশেষ জরুরী কাজে আমি আটকে পড়েছি। যেতে পারব না।

—বেশ, বলে দেব। আমার সঙ্গে কি কথা আছে বলছিলেন ?

—হ্যাঁ, নীলা কি কাল রাতে অথবা আজ সকালে এখানে এসেছিল ?

—কই না তো, কেন বলুন তো ?

—নীলার সঙ্গে তোমার শেষ কখন দেখা হয়েছে ?

—তা চার-পাঁচ দিন হবে। কেন ?

একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—অনেকদিন আগে তুমি বলেছিলে নীলার মন অন্যত্র বাঁধা আছে। জিনিসটা আমি আর একটু বিস্তারিত জানতে চাই।

এইবার চুপ করে থাকার পালা দীপকের। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর জানালার বাইরে কোন দুর্নিরীক্ষ্য দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে আত্মগতভাবে বলে যায় তার বক্তব্য : জিনিসটা আরও আগে হয়তো আপনাকে জানানো উচিত ছিল আমার। আকারে ইঙ্গিতে অবশ্য জানিয়েছি। স্পষ্ট করে বলি নি—ত্যুটো কারণে, প্রথমত আমি ভেবেছিলাম আপনি সবই জানেন— কিছুই অজ্ঞাত নেই আপনার কাছে। দ্বিতীয়ত আমি মনে করেছিলাম প্রসঙ্গটা আমার তরফে সঙ্কোচের, লজ্জার। কিন্তু পরে ভেবে মনে হয়েছে, সত্যিই আমার লজ্জা পাওয়ার কিছু ছিল কি ?

আমি নীলাকে ভালোবাসতে পেরেছিলাম—এটা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে লজ্জার কথা নয়। সে পারে নি, সেটাও আমার অপরাধ নয়। কিন্তু ওর মন কোথায় বাঁধা আছে তা অনেক অনেক দিন আগে থেকেই জানতে পেরেছিলাম আমি। আপনাকে জানানো কর্তব্য ছিল আমার। জানাই নি, কারণ আমি আশা করেছিলাম, ওর মন বদলে যাবে। সে মানুষটা নেপথ্যে রয়ে গেল চিরকাল—তার এক সপ্তাহের উপস্থিতির প্রভাব আমি কাটিয়ে উঠতে পারব না, এক যুগের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, অকৃতকার্য হয়েছিলাম আমি। তারও কারণ ছিল। অসীমের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করার একটা অবচেতন প্রেরণা ছিল নীলার মনের অন্তরতম কোণে। আমাকে তাই এনে বসিয়েছিল সেই শূন্য আসনে। তাই আমার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে, বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে, প্রীতি-সৌহার্দ্যের আদান-প্রদান চলেছে, কিন্তু সেই নেপথ্যবাসীকে একচুল বিচ্যুত করতে পারি নি আমি। এ-সব কথা আপনাকে কেমন করে বলি? তবু হয়তো সব কথা একদিন খুলে বলতাম—যদি না শেষদিকে খবর পেতাম অরুণাভের প্রতি আপনাদের সাম্প্রতিক আচরণের কথা। বাবার কাছে আমি শুনলাম, দীর্ঘ কারাবাসের পর সাত রাজ্য ঘুরে অরুণাভ এখানে এসে পৌঁছেছিল। সে নাকি প্রথমেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে—কিন্তু আপনি দেখা করেন নি। আপনার বাড়ির দরজা থেকে অরুণাভ ফিরে যায়। যে ছেলেটির জন্যে আপনি সব কিছু একদিন ত্যাগ করেছিলেন, কেন তাকে আপনি বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না, তা আমি আজও জানি না। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি দুরন্ত অভিমানেই এই অপমান করেছিলেন তাকে। ঐ ছেলেটির জন্যেই আপনার সুখের সংসার ভেঙে গিয়েছিল—ওর জন্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে অসীমকে—তাই ওকে সহ্য করতে পারেন নি আপনি। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, সেটা আসল কারণ নয়—আপনি ওকে নীলার সান্নিধ্যে আসতে দেন নি। তাই ভেবেছিলাম—আজ আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করছেন সেটা বাহুল্য মাত্র। তবু প্রশ্ন যখন আজ আপনি করছেন তখন আমাকে

ধরে নিতে হবে যে নীলার মন কোথায় বাঁধা পড়েছে তা আপনার অজানা। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই সব জানতাম। নীলার সঙ্গে ওর গোপন পত্রালাপ চলত কিনা আমি জানি না, শুধু এইটুকুই জেনেছিলাম যে অপেক্ষা করবে বলে ওরা পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুত ছিল। মাত্র সাত দিনের সান্নিধ্যে কেমন করে ওরা এত দ্রুত এত গভীরভাবে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারল তাও আমার ধারণার বাইরে, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে সেদিন থেকে ওর মন দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মতো একমুখে প্রতীক্ষা করছিল অরুণাভের প্রত্যাবর্তনের। তার পরের ঘটনা আপনি ভালো করেই জানেন, হয়তো আমার চেয়ে বেশীই জানেন। অরুণাভ আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারে নি, কিন্তু ঢুকেছিল কারখানায়। নাম লেখায় সে ফ্যাকটরির মজতুর লিস্টের রেজিস্টারে। শুধু যে রোজগারের ধান্দাতেই সে এসেছিল এ কথা মনে করি না। অবশ্য তার আসল লক্ষ্যটা কিসের উপর ছিল সে কথাও ঠিক জানি না। সম্ভবত অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা দুটির উপরই ছিল তার সমান লোভ। জিনিসটা ঘনিয়ে উঠছিল অলক্ষ্যে। প্রথম নজরে পড়ে বাবার। তিনিই তাকে প্রথম চিনতে পারেন। অবশ্য তার আগেই তাকে চিনতে পেরেছিল নীলা। সে যাই হোক, দেখলাম বাবা ওকে তাড়াবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। আপনার সঙ্গে তাঁর কি কথাবার্তা হয় তা আমি জানি না, কিন্তু দেখলাম ছেলেটিকে তাড়ানোর ব্যবস্থাটা পাকা হল। চুরির দায়ে ধরা পড়ল শ্রমিক নেতা। বাবার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকে না—প্রমাণিত হয়ে গেল অরুণাভ নন্দী একজন চোর।

পরমানন্দ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন: এ কথার মানে? তুমি কি বলতে চাও চুরির কেসটা সাজানো? ননীই ওটা সাজিয়েছে?

—বাবা সাজিয়েছেন, কি আপনি সাজিয়েছেন তা নিশ্চিত কেমন করে বলব বলুন—তবে এটা তো আপনিও স্বীকার করবেন যে, অরুণাভ নন্দী আর যাই করুক চুরি করবে না!

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন বৃদ্ধ।

নীরবতা ভঙ্গ করে দীপকই আবার; ক্ষোভম্লান কণ্ঠে যেন নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে ওঠে: আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় যখন বুঝতে পারি যে শুধু শ্রমিকবিদ্রোহ এড়াবার জন্যে বাবা এ কাজটা করেন নি —তিনি এ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছেন আরও জঘন্য স্বার্থের খাতিরে। তার মধ্যে নিজেকে জড়িত বুঝতে পেরে আমি নীলার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারি না।

—তুমি কি বলতে চাইছ দীপক?

আমি বলছি—এই চুরির কেসটা সাজানোর ব্যাপারে আপনার যে অবদান তার তবু একটা অর্থ হয়।—নীলাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য, হয়তো সেইজন্য এ অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছেন আপনি। কিন্তু বাবা? তিনি ওকে তাড়াতে চেয়েছেন শ্রমিকবিদ্রোহের কথা ভেবে নয়—আমার জন্যে! এ লজ্জা আমি ভুলি কি করে?

পরমানন্দ ধীরে ধীরে বলেন—নীলা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে দীপক!

—চলে গেছে! মানে? কখন? কোথায়?

ওর কাছে বুকের ভার নামাতে থাকেন পরমানন্দ। উনি বুঝতে পেরেছেন, এ ছেলেটি সত্যিই ভালোবাসে নীলাকে। দীপক চুপ করে শোনে সব কথা।

পরমানন্দ শেষে জিজ্ঞাসা করেন: তোমার কি মনে হয় ও অরুণাভের ওখানে গেছে।

—অসম্ভব নয়।

—তবে সেখানেই চললাম আমি।

দীপক উত্তেজিতভাবে ওঁকে বাধা দেয়—অমন কাজও করবেন না জ্যেঠামশাই। ওরা ধর্মঘট করেছে—এখানে ওখানে মীটিঙ হচ্ছে। আপনাকে একলা পেলে ওরা ভালোমন্দ কিছু একটা করে বসতে পারে। আপনি বরং বাড়ি ফিরে যান। আমি খোঁজ নিচ্ছি লোক পাঠিয়ে।

ননীমাধবের বাড়ি থেকে আবার রিকশা চেপে বেড়িয়ে পড়েন উনি। অনলবর্ষী সূর্য তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। চারটে বেজে গেছে। ক্লান্ত দেহটা রিকশায় এলিয়ে দিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে থাকেন। চিন্তার আর পারম্পর্য থাকছে না। কখনও মনে পড়ছে অসীমকে—কখনও বৈশাখীকে, কখনও অ্যানির মুখখানা ভেসে উঠছে মনের পটে। নীলা? না, নীলার কথা আর তিনি ভাববেন না। যে মেয়ে তার বাপের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে কুলি-ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আর।

অরুণাভ তাহলে সত্যিই চুরি করে নি! এটা তাহলে ননীমাধবের একটা কারসাজি! ননীমাধব তাহলে ঠিকই চিনেছিলেন পরমানন্দকে! তাই আসল কথাটা তাঁর কাছেও গোপন রেখে গেছেন। প্রথমটা রাগ হয়েছিল ননীমাধবের উপর—এই হীন কাজের জন্যে। এখন কিন্তু আর রাগটা নেই—মনে হচ্ছে ঐ ননীমাধবই তো একমাত্র লোক যে সম্মান করেছে তাঁর আদর্শনিষ্ঠাকে। সাহস করে বলতেও পারে নি সাজানো চুরির কেসের কথাটা। কিন্তু অরুণাভ চুরি করুক আর নাই করুক—সে জন্য তো তাঁর আপত্তি নয়। তাঁর আপত্তি হচ্ছে অন্য কারণে। আজ তিনি আর অরুণাভ নন্দী এক নৌকার যাত্রী নন। তিনি চলেছেন ভাঁটিতে আর অরুণাভ উজানে। তিনি চাইছেন দেশের শিল্প-উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে। শ্রমিক আর মালিক হাতে হাত মিলিয়ে গড়ে তুলবে নূতন নূতন শিল্পসম্ভার। বিদেশী মুদ্রা আহরণ করতে হবে। নামতে হবে বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত হবে শ্রমিক-মালিকের যৌথ প্রচেষ্টায়। এ জন্যে অবশ্য স্বার্থত্যাগ করতে হবে দু পক্ষকেই। শ্রমিককে দিতে হবে জীবনধারণের উপযুক্ত পরিবেশ। শুধু জীবনধারণ নয়—উন্নততর জীবনযাপনের। ওদের জীবনের মান উন্নয়ন করতে হবে। তাই তো উনি ব্যবস্থা করেছেন কুলি-ব্যারাকে পাকা রাস্তা, পাকা নর্দমা,—ব্যবস্থা করেছেন প্রাথমিক শিক্ষার, স্বাস্থ্যরক্ষার। শ্রমিকও দেখবে

বৈকি মালিকের স্বার্থ। ওঁর কারখানার লোকেরাও ওঁকে দেবতার মতো ভক্তি করে। চীপ ক্যান্টিন খোলার দিন ওঁকে ওরা পরিয়ে দিয়েছিল একটা মোটা গাঁদাফুলের মালা।

অরুণাভ কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছে জিনিসটা। সে চায় ধর্মঘট করে, চাপ দিয়ে, শ্রমিক ইউনিয়ন পাকিয়ে মালিককে শায়েস্তা করতে। বন্ধুত্বের সম্পর্কটা সে স্বীকার করে না। শ্রমিক আর মালিক যেন খাদ্য আর খাদক। আশ্চর্য! সে কোনো আপস চায় না—সে শুধু লড়তেই চায়। আর এই লড়াইয়ের জন্য যদি কারখানাটা বন্ধও থাকে কিছুদিন—দেশের শিল্প-উৎপাদন ব্যাহত হয়—তাতেও সে দুঃখিত নয়।

এই আদর্শগত বিভেদের জন্যই আজ তিনি ক্ষমা করতে পারেন না অরুণাভকে। সহ্য করতে পারেন না তার উদ্ধত বিদ্রোহীর ভঙ্গিটা।

—এই রোখো! রোখো!

দাঁড়িয়ে পড়ে রিকশাটা। রিকশাওয়ালাকে বলেন হুডটা তুলে দিতে। পড়ন্ত রোদে বড় কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। রিকশাওয়ালা হুডটা তুলে দেয়। গাড়িটা চলছিল পশ্চিমমুখো; সূর্য দিগ্বলয়ে হেলে পড়েছে। হুড তুলে দেওয়াতেও রোদটা আটকাল না। সামনে থেকে রোদ লাগছে। রিকশাওয়ালা সামনের পর্দাটা ফেলে দেয়। ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়লেন উনি। হঠাৎ একটা কথা মনে হল তাঁর। রিকশাওয়ালাকে বললেন বাঁ দিকের রাস্তায় ঘুরে যেতে। কুলিবস্তিতেই যাবেন তিনি একবার। ঘেরাটোপের মানুষকে আর কে চিনবে? বরং রিকশা থেকে নামবেনই না; রিকশাওয়ালাকে দিয়েই খোঁজ নেবেন।

বাঁ দিকের কাঁচা সড়কে নামল রিকশাটা। এঁকেবেঁকে চলল কুলি-ব্যারাকের দিকে। এ পথে তিনি কখনও আসেন নি ইতিপূর্বে। আসবার প্রয়োজনও হয় নি। তিনি উপরতলার বাসিন্দা—নিচের মহলের খবরদারির প্রয়োজন হলে লেবার-স্ট্যাটিসটিক্স-এর প্রোফর্মাটাই দেখেন। সেই চার্ট থেকেই জানতে পারেন লেবার ব্যারাকের সংবাদ।

আজ এখানে তাঁকে আসতে হয়েছে প্রাণের দায়ে। মনে পড়ছে ঠিক এ পথে না এলেও এ পাড়ায় একদিন এসেছিলেন তিনি, যেদিন চীপ ক্যান্টিনটা খোলা হয়। তিনি একা নন—অনেক গণ্যমান্য অতিথিই এসেছিলেন সেদিন। রাস্তাগুলো ছিল ঝকঝকে—নর্দমাগুলো ছিল পরিষ্কার। কিছু দূরে দূরে বসানো ছিল সাদা-কালো ডোরাকাটা ড্রাম—অর্থাৎ ডাস্টবিন। সমস্ত এলাকাটা লাগছিল যেন চিত্রকরের আঁকা একখানা সুন্দর ছবি। মনে আছে, সেদিন মনে মনে তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন। বস্তিজীবনের যে চিত্র দিশী-বিদেশী উপন্যাসে পড়া ছিল—তার সঙ্গে আসমান-জমিন পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন তাঁদের কারখানার। খুশী হয়েছিলেন।

আজ বুঝতে পারছেন ভুলটা।

রাজ্যের আবর্জনা এসে জমেছে পথে। নর্দমাগুলো ভরে আছে নীলচে কালো থকথকে কাদা-জলে। একটা কালভার্ট মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পথের উপর। নামতে হল অগত্যা। জলপ্রবাহ আটকে গেছে এখানে। একটা কুকুর চাপা পড়েছে লরিতে। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হয়, চার-পাঁচ দিন পূর্বেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে বেচারির—যদিচ তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোনও ব্যবস্থা হয় নি এখনও। পথে লোকজন নেই। কয়েকটা শকুন এসে নেমেছে এই সুযোগে। অনেক মড়াকাটার অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে ডাক্তার চৌধুরীর গা ঘুলিয়ে উঠল। খালি পেটে আছেন বলে কি? হর্ন দিতে দিতে একখানা ময়লা-ফেলা লরি এসে পড়ল প্রায় ঘাড়ের উপর। রিকশাটা কাদায় নেমে পাশ দিল। পাশ দিয়ে চলে গেল লরিটা। কয়েকটা কাদামাখা শালপাতা উড়ে এসে পড়ল রিকশায়—ওঁর খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবিটায় যেন রসিকতা করেই এঁকে দিল একটা কলঙ্কচিহ্ন। পরমানন্দ লক্ষ্য করে দেখলেন, ময়লা-ফেলা লরিটার তলদেশ প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সমস্ত রাস্তায় দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থের একটা ধারাচিহ্ন আঁকা পড়ে যাচ্ছে—গাড়িটার পিছন পিছন। সম্ভবত গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার পূর্বেই লরি ভারমুক্ত হবে।

এই তা হলে তাঁর কুলি-ব্যারাকের জীবনালেখ্য ?

রিকশাটা দাঁড়িয়ে পড়ে একটা পথের বাঁকে। রিকশাচালক জানায় পি-নাইন ব্যারাকে এসে গেছে গাড়ি। উনি তাকেই বলেন সামনের বাড়ির কড়া নাড়তে, লোক ডাকতে।

অল্প পরে লোকটা ফিরে আসে দুঃসংবাদ নিয়ে। এ বাড়ির বাসিন্দার চাকরি গেছে। নোটিশ পেয়েছিল কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। কদিন আগে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

কী আশ্চর্য ! এই সহজ কথাটা খেয়াল হয় নি তাঁর।

অল্পবয়সী দুটি ছোকরা এগিয়ে আসে রিকশা দেখে। খড়িওঠা রুক্ষ দেহ—ময়লা ভর্তি সারা গায়ে। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন—নিম্নাঙ্গে খাকি ধুলিমলিন হাফপ্যান্ট। এসে বলে : ওস্তাদদাকে খুঁজছেন ?

—ওস্তাদদা ? সে কে ? আমি খুঁজছিলাম অরুণাভ নন্দাকে—এই বাসাতেই থাকত না ?

—হ্যাঁ, ওকেই আমরা ওস্তাদদা বলি। ওস্তাদদাকে কোম্পানি তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই শালা ম্যানেজার আর ঐ হারামজাদা চৌধুরী ডাক্তারের দমবাজি।

চমকে ওঠেন পরমানন্দ। বলেন : চৌধুরী ডাক্তার কে ?

—কে জানে, হবে কোন ···

কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। ও ছোকরা কি জানে ঐ অশ্লীল শব্দটার অর্থ ? ছেলেটি আবার বলে—তা আপনি বুঝি পার্টি অফিস থেকে আসছেন ? ওস্তাদদার কাছে ?

—হ্যাঁ, কোথায় থাকে অরুণাভ বলতে পার ?

—জানব না ? আবে এ রিক্‌শালা, শুন্ !

ওরা রিকশাচালককে হদিসটা বাতলে দেয়। পরমানন্দ তখন অবাক হয়ে ভাবছিলেন এদের কথা। কতই বা বয়েস ওদের ? এখন থেকেই মনুষ্যত্বকে গলা টিপে ধরা হয়েছে। লেখাপড়া শিখবে না, ভদ্র কথা, ভদ্র আচার কাকে বলে জানবে না কোনদিন। এই বিষ-বাষ্পের শ্বাসরোধী বাতাবরণে তিলে তিলে নীল হয়ে যাবে ঐ অমৃতের

পুত্রেরা। জীবনের চরম শিক্ষাই হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ম্যানেজার ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে নিকট কুটুম্ব আর মালিক···

এই তাঁর কীর্তি।

এর জন্যে মনের গভীরে তিনি পোষণ করেন অহঙ্কার! শিল্পোন্নয়ন করছেন দেশের। গঠন করছেন জাতি! শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়ন—একমাত্র লক্ষ্য তাঁর!

রিকশাওয়ালা বেঁকে বসল। সেই কোন সকালে ওঁকে রিকশায় তুলেছে। এখনও একটা পয়সা হাতে পায়নি। ঘুরে মরছে সারা শহর। সে আর যাবে না। ওকে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হোক এবার।

—কত ভাড়া হয়েছে তোমার? প্রশ্ন করেন পরমানন্দ।

—তা টাকা তিনেকের কম নয়।

একখানা পাঁচটাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলেন: চলো—ঐ যে কি বস্তির কথা বলল ওরা—ওখানে চলো।

রিকশাওয়ালা নরম হয়। আবার প্যাডলে উঠে বসে। এঁকে-বেঁকে ফিরে চলে। পিছন থেকে বস্তির ছোকরাটি মন্তব্য করে তার দোস্তকে: মালদার লোক মাইরি; দেখলি কেমন ঝড়াক্‌সে নিকলে দিলে কড়কড়ে নোটখানা!

রিকশাখানা যখন এসে পৌঁছল বস্তিটায়, সূর্য তখন ক্লান্ত দেহে এলিয়ে পড়েছে পশ্চিম দিগ্বলয়ে। আঁকাবাঁকা পথের দুধারে মেটে ঘর, খাপড়ার চাল। পথের পাশে টিউকলের সামনে লম্বা কিউ। জলে থিকথিক করছে সেখানটা। ঘিনঘিনে এলাকাটা পার হয়ে হঠাৎ একটা ফাঁকা মাঠে এসে পৌঁছল রিকশাটা। এখানেই বোধহয় মীটিঙ হবে। কিসের মীটিঙ? অনেক মেহনতী মানুষ জড়ো হয়েছে মাঠে। কয়েকটা ফেস্টুন দেখা যাচ্ছে। এঁকেবেঁকে আছে বলে লেখাগুলো এখন পড়া যাচ্ছে না। দরমা-চাটাইয়ের উপর খবরের কাগজ এঁটে তার উপর লাল কালিতে কি যেন লেখা আছে। বাঁশের খুঁটোর মাথায় ঐ দাবিটাকেই

ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে মাঁটিতে। ময়দানের মাঝখানে খান কয়েক চৌকি পাতা। পাশে একটা বংশদণ্ডে উড়ছে একটা নিশান। রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে আছে পাতাকাটা পরমানন্দের দিকেই।

রিকশাওয়ালাই খোঁজ নিতে নিতে এসে হাজির হল বাড়িটার সামনে। বাড়ি অবশ্য গৌরবে। আসলে খোলার চালার একটা কামরা। সেখানেও অনেক লোক জটলা করছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন। রিকশা দেখে জনতা পথ দেয়। ত্রিচক্রযান এসে থামল চালাখানার সামনে।

—ওস্তাদ? হ্যাঁ, এই বাড়িই। হ্যাঁ, আছেন ভেতরে। কে এসেছেন?

পর্দা সরিয়ে রিকশা থেকে নেমে আসেন পরমানন্দ।

ওরা যেন ভূত দেখল! গুঞ্জন উঠল একটা জনতার মধ্যে। ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সোজা উঠে গেলেন খোলার ঘরখানিতে। প্রথমেই নিচু চালাতে একটা ঠোকর খেলেন মাথায়। সেটাও গ্রাহ্য করলেন না।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। হ্যারিকেন জ্বলছে একটা। জনা আট-দশ লোক নিম্নস্বরে কি যেন আলোচনা করছে। আগন্তুককে দেখে চমকে ওঠে সবাই।

ঘরে কোনো আসবাব নেই। একপাশে দড়ির একটি খাটিয়া—তার নিচে মাটির একটা কলসির মুখে চাপা দেওয়া এনামেলের একটি গ্লাস। ওপাশে একটি টিনের সুটকেশ। দেওয়ালে দুখানা ছবি—একটি সুভাষচন্দ্রের, অপরখানা লেনিনের। দরমার দেওয়ালে কঞ্চির গোঁজে টাঙানো আছে একটি হ্যাণ্ডলুমের ময়লা হাফশার্ট। মেঝেতে তালপাতার একটি চাটাই পাতা। তার উপরেই বসেছিল লোকগুলো পা মুড়ে। অরুণাভও ছিল ওদের মাঝখানে—পরনে তার পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জি।

—কাকে চাই?

—তোমাকেই। কয়েকটা কথা ছিল।

—বসুন।

পরমানন্দ চাটাইয়ের উপর পা মুড়ে বসে পড়েন। লোকগুলো উঠে দাঁড়ায়—সরে বসে।

—বলুন, কি বলতে চান—নির্বিকার কণ্ঠ অরুণাভের। তার সামনে খোলা একটি খাতা অথবা বই—তারই পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে কথাটা।

পরমানন্দ প্রত্যুত্তরে বলেন : শুধু তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার —নিভৃতে।

বইটা মুড়ে রেখে দেয় অরুণাভ। মুখোমুখি তাকায় এতক্ষণে পরমানন্দের দিকে। সোজা প্রশ্ন করে—ফ্যাকটরির ধর্মঘট সম্বন্ধে কথা কি ? তা হলে এঁদের সকলের সামনেই কথা বলতে হবে।

—না, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটি ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। কারখানার স্ট্রাইকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

—ও !

অরুণাভ তার অনুচরদের বলে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে। অধিকাংশই উঠে দাঁড়ায়। অল্পবয়সী একটি ছেলে হঠাৎ বলে বসে—ওস্তাদ, এ কাজ তুমি কোরো না। ওদের কারসাজি বুঝতে পেরেছি আমরা।

—বাদল, তুমি বাইরে যাও।

ছেলেটি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওঁদের দুজনের দিকে। তারপর বলে—ওস্তাদ ! আগুন নিয়ে খেলা কোরো না তুমি। এতগুলো মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেললে তার ফল ভালো হয় না। এত সহজ কথাটাও বুঝতে পারব না আমরা ভেবেছ ?

—বাদল ! তুমি যাবে কিনা—মুষ্টিবদ্ধ হয় অরুণাভের হাত।

বাদল একবার আশেপাশে তাকিয়ে নেয়। লক্ষ্য করে দেখে অনেকেরই নীরব সমর্থন আছে তার ঔদ্ধত্যে। পাশ থেকে মোটা ভাঙা ভাঙা গলায় প্রৌঢ় রহমৎ বলে ওঠে—লেকিন ওস্তাদ। তুমিই হিসাব জুড়ে লেও ভাই—উর কুন গোস্তাকি হল কিনা। তুমার সাথে মালিকের আর কুন কথা আছে ? ই লোগদের মনে ধোঁকা লাগল তো কি ফিন অ্যান্যায় হল ?

অরুণাভ উঠে দাঁড়িয়ে বলে : বড়ভাই ! এটুকু বিশ্বাস যদি না থাকে তোমাদের তবে কেন আমার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলে ? যদি মনে করে থাক—একলা পেয়ে এক টুকরো রুটির লোভ দেখিয়ে ওরা আমাকে ধোঁকাবাজি দেবে তবে আমাকে এ কাজের ভার দেওয়া ঠিক হয় নি। তুমি আজ বিশ বছর আছ এ কারখানায়—তোমাকে আমি বড়ভাই বলেছি—তোমাকে না জানিয়ে কোনও গোপন শর্তে মালিকের সঙ্গে আমি হাত মেলাতে পারি ?

রহমৎ তার প্রায়-সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে—খামোশ ! ব্যস খুব। আ যাও ভাইসব।

অধিকাংশ লোকেই বেরিয়ে যায় এ কথায়। শুধু বাদলের অগ্নি-বর্ষী অক্ষিতারকা তুটি তখনও জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। রুখে ওঠে সে : বড়ভাই, আমি ঘরপোড়া গোরু। এর আগে পাঁচ ঘাটে জল খেয়েছি আমি। এ ব্যাপার আমার জানা আছে। আমি যাব না।

রহমৎ তার হাম্বরধরা লৌহকঠিন হাতখানা বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে। গেঞ্জি না হয়ে শার্ট হলে বোতামগুলো থাকত যেখানটায় বাদলের একমুঠো জামা সেখান থেকে আটকে পড়ে রহমতের বজ্র-মুষ্টিতে। মুখে কিছু বলে না রহমৎ ; বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দেয় দ্বারের দিকে।

—ঠিক হ্যায়।—বেরিয়ে যায় বাদলও।

অরুণাভ ঝাঁপের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলে : বলুন এবার।

—তুমি কি আশা কর এভাবে ধর্মঘট করে কোম্পানিকে জব্দ করতে পারবে ?

—ধর্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে আবার ওদের ফিরে ডাকতে হয়।

—ও আচ্ছা।—সামলে নেন পরমানন্দ নিজেকে। তারপর একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা সোজাসুজি করে বসেন—নীলা কোথায় ?

—আমি জানি না।

—জান।

চোখ তুলে অরুণাভ ওঁর দিকে তাকায়। বলে - চোখ রাঙাবেন না—এটা আপনার কারখানা নয়।

—সে আজ তোমার এখানে আসে নি?

—না।

—না? আমি বিশ্বাস করি না।

—সে আপনার মর্জি।

—তোমাকে আমি পুলিসে দিতে পারি—তা জান? জেল খাটাতে পারি—সেটা মনে আছে?

—আছে, কারণ যে পরিমাণ অর্থ থাকলে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলে পোরা যায় তা আপনার আছে, তা জানি। কিন্তু আপনি হিসাবে একটি ভুল করছেন; জেলখাটা জিনিসটাকে আজ আপনি যতটা ভয়াবহ মনে করছেন—আমি তা করি না। তাই তো সেদিন বলেছিলাম, অভাবেই শুধু স্বভাব বদলায় না ডক্টর চৌধুরী, প্রাচুর্যেও বদলায়।

—আমি নিশ্চিত জানি—আমার বাড়ি থেকে চলে আসার পর সে তোমার এখানে এসেছিল।

—ঠিকই জানেন আপনি। সে এসেছিল-- তবে আজ নয়—কাল রাত্রে। গভীর রাত্রে।

—তারপর?

—তারপর আর কি জানতে চান বলুন?

হঠাৎ ভেঙে পড়েন কুলিশকঠোর পরমানন্দ—আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন-- অরুণ, আমি মিনতি করছি। তুমি জান, আমি কি জানতে চাইছি। বাপ হয়ে আর কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি আমি?

অরুণাভ এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—হ্যাঁ জানি; আপনার প্রশ্নের উত্তরে তাই জানাচ্ছি ননীমাধববাবুর পক্ষে কোনও বাধা নেই আপনাকে বৈবাহিক বলে স্বীকার করায়।

নৈঃশব্দ্যের একাধিপত্য পরের কয়েকটি মুহূর্তের উপর। নীরবতা ভেঙে অরুণাভই আর একটু টুকরো খবর অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় পরমানন্দের ঔৎসুক্যের সম্মুখে—কাল রাত্রে সে এখানে থাকে নি—চলে গিয়েছিল আপনার গুরুদেবের কাছে। আজ সকালে সেখান থেকেও চলে গেছে—কোথায় তা আমি জানি না। আর কিছু জানতে চান ?

—সে আজ সকালে সেখান থেকে চলে গেছে তা তুমি জানলে কি করে ?

টাঙানো কামিজটার পকেট থেকে একটা বন্ধ ভারী খাম বার করে সেটা অরুণাভ ছুঁড়ে দেয় পরমানন্দের দিকে, বলে—আজ সকালে আমার লোক এটা দিতে গিয়েছিল—জেনে এসেছে সে ওখানে নেই।

ভারী খামটার উপর গোটা গোটা অক্ষরে নীলার নাম লেখা। নাড়াচাড়া করে বন্ধ খামটা পরমানন্দ ফেরত দেবার উপক্রম করেন। অরুণাভ বাধা দিয়ে বলে—ওটা আপনার কাছেই রাখুন। যদি কোন-দিন নীলার সন্ধান পান—তাকে দেবেন।

তারপর মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে বলে—আপনিও পড়ে দেখতে পারেন, যে প্রশ্ন আপনি করতে পারলেন না, তার জবাব পাবেন ওটায়।

চিঠিখানা অগত্যা গ্রহণ করতে হয় পরমানন্দকে।

—আর কিছু বলবার আছে কি ?

—হ্যাঁ, একটা কথা। একদিন তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করতে। মেদিনীপুর থেকে খুঁজে খুঁজে এতদূর এসেছিলে শুধু আমাকে বিশ্বাস কর বলেই। তোমার সে বিশ্বাসের, সে শ্রদ্ধার কণামাত্রও কি অবশিষ্ট নেই আজ ?

ভেবেছিলেন খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন ; কিন্তু জবাব দিতে মুহূর্ত বিলম্ব হল না অরুনাভের। বললে—না। কারণ আপনি আর সেই মানুষ নন -আপনি আদর্শচ্যুত, আপনি ব্রাত্য।

—এই জন্যেই কি নীলার আশ্রয় হয় নি কাল এ বাড়িতে ?

—না। সেটার কারণ বুঝতে পারবেন আমার চিঠিখানা পড়লেই। কিন্তু এবার আসুন আপনি। আমাদের মীটিঙ শুরু হবে এইবার। ওরা অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

পরমানন্দ উঠে পড়েন। দ্বারের দিকে পা বাড়ান।

—দাঁড়ান। আপনাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব।

—প্রয়োজন হবে না।

—হবে। না হলে হয়তো আপনি সুস্থ শরীরে ফিরে যেতে পারবেন না এ পাড়া থেকে। যেতে হবে হাসপাতালে।

পরমানন্দ এতক্ষণে একটা জবাব দিতে পারেন—হাসপাতাল জিনিসটাকে আজ তুমি যতটা ভয়াবহ মনে কর অরুণ, আমি ততটা করি না। সঙ্গে যাবার দরকার হবে না তোমার।

জামাটা গায়ে দিতে দিতে অরুণাভ বলে : একদিন ডাক্তার পরশুরাম চৌধুরী আমার চিকিৎসা করেই শুধু ক্ষান্ত হন নি—নিজে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ে—তাই আপনি না চাইলেও আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। আমি জানি বাদলরা ওত পেতে বসে আছে আপনার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে। চলুন।

পরমানন্দ ওর প্রসারিত হাতটি গ্রহণ করে হঠাৎ বলে বসেন—পরশুরাম চৌধুরীর ঋণ তুমি আজও মনে করে রেখেছ অরুণ?

ওঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অরুণাভ বলে—ডাক্তার পরশুরাম চৌধুরীকে কোন বিপ্লবী চেষ্টা করেও ভুলতে পারবে না—তিনি আমার যে উপকার করেছেন তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। শুধু আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তিনি অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন; তিনি আমার পিতৃবন্ধু, তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি আমি! যেমন আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি হবু এম. এল. এ. ডাইরেকটর পরমানন্দ চৌধুরীকে—যিনি মজদুর-উত্থান দমন করতে অনায়াসে মিথ্যা চুরির কেস সাজান, যিনি সাধারণ মানুষকে ঢুকতে দেন না তাঁর বাড়ির ফটকের ভিতর।

পরমানন্দের মুঠি আলগা হয়ে যায়! পাশাপাশি পথে নেমে

আসেন ওঁরা। রিকশায় বসেন পরমানন্দ। রিকশার পাশে পাশে চলতে থাকে অরুণাভ। বড় রাস্তা পর্যন্ত ওঁকে এগিয়ে দিয়ে অরুণাভ ফিরে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। শহরতলীর বস্তি অঞ্চল। রাস্তায় জ্বলছে বিজলী বাতি। কারখানা এলাকার জনাকীর্ণ পথ। সিনেমার শো শুরু হচ্ছে। বিকৃত যান্ত্রিক আর্তনাদে পরিবেশিত হচ্ছে হিন্দী গান। রিকশাটা ভিড় বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে চলল শহরের অপর প্রান্তে।

বুক ঠেলে একটা কান্না আসছে। হেরে গেছেন। নিঃসংশয়ে হেরে গেছেন তিনি চূড়ান্তভাবে। শুধু নীলার দৃষ্টিতে নয়—শুধু অরুণাভের চোখেই নয়—সারা দুনিয়ার কাছে আজ তিনি আদর্শচ্যুত, তিনি পতিত। মজদুর-নেতা আজ আন্তরিক ঘৃণা করে তাঁকে! রহমৎ আর বাদলেরা তাঁর পথের পাশে আজ ওত পেতে থাকে। এমন কি বস্তির ঐ বালকটা পর্যন্ত অশ্লীল বিশেষণ যুক্ত করে উচ্চারণ করে তাঁর নাম। কারখানার বস্তিজীবন আজ তিনি নিজের চোখে দেখে গেলেন —এই তাঁর কীর্তি। এত বড় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেও তিনি তৃপ্ত হন নি। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে নূতন কীর্তির সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগেছেন এবার। বিনিময়ে কিশলয়বাবুর কয়েক শত একর জমির মূল্য বিশগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামনগরীটা গড়ে তুলতে হবে এমন এলাকায় যেখানে সমস্ত জমির মালিক তাঁরই মতো আর একজন নিঃস্বার্থ দেশকর্মী! এই এঁদের দেশসেবা! এই তাঁদের মতো সমাজসেবকের কুম্ভীরাশ্রু কৃষক-মজুরদের জন্য। দীপক পর্যন্ত মনে করেছে পরমানন্দই চুরির কেসটা সাজিয়েছেন। সত্যরক্ষার জন্য একদিন যিনি অন্ধকূপের অন্তরালে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, একমাত্র পুত্রকে যিনি সত্যধর্মের যূপকাষ্ঠে স্বহস্তে বলি দিয়েছেন সেই পরমানন্দকে কী চোখে দেখছে দুনিয়া! চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তাঁর। ঠিকই বলেছে নীলা—আর কোনও সংশয় নেই। তিনি আদর্শচ্যুত, তিনি ব্রাত্য

রিকশা এসে থামল বাড়ির সামনে।

নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। বাইরের দরজার পাশে বসে আছে নন্দ বেয়ারা।

সমস্ত বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। কত দিনের কত আনন্দঘন ইতিবৃত্ত জড়িয়ে আছে বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঐ কদম গাছটার ডালে একদিন দোলনা ঝুলিয়েছিলেন। তখন নীলাও হয়নি। শুধু অসীম এসেছে সংসারে। ফুটফুটে এতটুকু একটা বাচ্চা। দোলনায় বাচ্চাকে শুইয়ে অ্যানি দোল দিত। আর ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইত—নার্সারি লালেবাই। ঘাসের উপর বেতের ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে উনি চুরুট খেতেন আর বই পড়তেন। এই বড় লনটায় কতদিন শীতকালে হয়েছে 'ওপন এয়ার বুফে লাঞ্চ'। অ্যানি আর মিস গ্রেহাম প্রাণান্ত পরিশ্রম করত অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে। কী মধুর সে-সব দিনগুলি। বিবাহবার্ষিকীতে বরাদ্দ ছিল একটা সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা বড় হবার পর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হত ওদের জন্মদিনে। অর্ধশতাব্দীর স্মৃতিবিজড়িত লাল পয়েন্টিং করা বাড়িটার সামনে আজও একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। সারাদিন অভুক্ত তিনি। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল বিকালে—এখন যেন সে বোধটাও নেই। শুধু ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে পা দুটো।

নন্দ এসে ওঁকে ডাকে—ঘরে যাবার জন্য।

ঘর? না থাক। ইচ্ছা করছে না আর এখন উঠতে। নন্দকে বলেন বাগানের আলোটা জ্বেলে দিতে। ওখানে বসেই তিনি ভারী খামটা খুলে ফেলেন। বার হয়ে পড়ে অরুণাভর অবরুদ্ধ বাণী।

"নীলা,

এইমাত্র তোমাকে তোমার বাবার গুরুদেবের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারি নি। পারা সম্ভবও নয়। দীর্ঘ এক যুগ প্রতীক্ষা করে আছি তোমার আগমনের, সেই তুমি এসে দাঁড়ালে আজ আমার দরজায়; অথচ

এমনই দুর্ভাগ্য আমার, দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিতে হল তোমাকে। তাই সব কথা বুঝিয়ে বলার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না —সম্ভবত শোনার মতো মানসিক স্থৈর্যও ছিল না তোমার। তাই এ চিঠি দিচ্ছি।

"তোমাকে আমার বাসার দ্বার থেকে ফিরে যেতে হয়েছে। উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে তুমি এসেছিলে এই দরমার ঘরে—বাকী জীবনের দিনগুলি এখানে বিকিয়ে দেবার সঙ্কল্প নিয়েই—কিন্তু আমিই তা হতে দিই নি। তাই আমার কাছে তোমার একটা কৈফিয়তও পাওনা বৈকি।....

"ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। দুনিয়াটা আমার কাছে তখন ছিল অত্যন্ত সীমিত। বাবা ছিলেন—তুমি তো জানই—বিপ্লবী। ইংরাজকে তাড়াবার মন্ত্রণায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। প্রাণ দিলেন ঐ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই। আমার মাকে আমি তখনও কাঁদতে দেখি নি। বাবা যখন মারা যান, আমি তখন ছোট। সব কথা মনে নেই। তারপর জ্ঞান হওয়ার পর কখনও তাঁকে কাঁদতে দেখিনি। আমাকে তিনি গল্প শোনাতেন—শিবাজীর গল্প, রাণা প্রতাপের গল্প, গুরু গোবিন্দের কথা, ক্ষুদিরামের কাহিনী। স্বামীকে হারিয়ে যে তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েন নি এটা প্রমাণ করতেই যেন আমাকে ঐ পথের নির্দেশ দিলেন। আশ্চর্য মানুষ তিনি। তাঁরই হাতে গড়া মানুষ আমি। তারপর একদিন তিনিও অস্তমিত হলেন আমার জীবনদিগন্ত থেকে। তাঁর একটা কথা মনে আছে আমার: 'যারা আমাদের মানুষ বলে মনে করে না—যারা বাধ্য করছে আমাদের কুকুর-বেড়ালের মতো জীবন যাপন করতে—তাদের কখনও ক্ষমা করিস না অরু।' পরে ঐ কথাগুলোই পড়েছিলাম 'পথে দাবী'তে।

"নীলা, আমার মা সম্ভবত ইংরাজ-শাসকদের উদ্দেশ করেই ও কথা বলেছিলেন—অন্তত সে যুগে আমি সেই অর্থেই গ্রহণ করেছিলাম তাঁর উপদেশ। ক্রমে আমার চিন্তাশক্তির প্রসার

হয়েছে—আজ মনে হয় কথাটা দেশকালের অত ক্ষুদ্র আবরণে আবদ্ধ নয়। তাই আজ ইংরাজ শাসকদের অবর্তমানেও আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় নি। আজ তোমার বাবা এবং আমি সে সংগ্রামে বিপক্ষ শিবিরের সৈনিক।

আজ তুমি উপরতলার বাসিন্দা আর আমি থাকি নিচের মহলে। জানি, তুমি বলবে—স্বেচ্ছায় ঐ উপরের মহল ছেড়ে নেমে এসেছ তুমি আমার সমতলে। পরমানন্দের প্রাসাদ ছেড়ে যখন পরমদুঃখীর কুটিরে এসে দাঁড়িয়েছ তখন ফিরে যাবার পথ যে তুমি রুদ্ধ করে দিয়ে এসেছ সেটা বোঝা শক্ত নয়। আমি অবাক হয়ে যাই তোমার বাবার কথা ভেবে। ভদ্রলোকের সবই ছিল—সবই খুইয়েছেন; অথচ আশ্চর্যের কথা, আদর্শের কারবারে আজ যে তিনি দেউলিয়া এ খবরটাও তিনি জানেন না। সম্পদের সঙ্গে আদর্শের, চরিত্রের, বোধহয় একটা নিত্যবৈরী আছে। কী একটা নাটকে পড়েছিলাম নায়কের বাইরের ঘরে টাঙানো বাইবেলের একটা বাণী: 'সূচের ছিদ্রপথে উট গলে যেতে পারে—কিন্তু কোন বড়লোক কখনও স্বর্গে যেতে পারে না।' সম্পদ, প্রতিপত্তি, সম্মান মানুষের আদর্শকে পিষে মারে। অথচ মানুষ জানতেও পারে না যে সে আদর্শচ্যুত হয়েছে। তোমার বাবারও আজ সেই দশা। তুমিও তাঁর সাহর্যে সে কথা বুঝবার মতো বোধশক্তি হারিয়েছ। আজ সাময়িক উত্তেজনাতে সব ছেড়ে তুমি আমার দ্বারে এসেছ দাঁড়িয়েছ এটা সত্য; কিন্তু জীবনটা তো নাটক নয়!

"সিনেমায় আর রঙ্গমঞ্চে যেটা বেশ স্বাভাবিক, জীবনে তাই অবাস্তব। তুমি যখন গতকাল রাত্রে একা এসে দাঁড়ালে আমার দরজায় ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যদি পঞ্চম অঙ্কের শেষ যবনিকা নিশ্চিত পড়বে জানতাম তাহলে আমিও তোমার হাতদুটি ধরে ভাবতে পারতাম 'এতদিন পরে এসেছে কি তার আজি অভিসার রাত্রি।' এটা নাটক হলে কোনও কথা ছিল না। নাটকের দর্শক

খুশী মনে বাড়ি যেত। কিন্তু জীবনের দর্শক জানে, নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। নিকষকালো অমারাত্রির অন্ধকারে তোমার এ অভিসারের রোমান্টিকতার পরেও আছে সকালবেলার চড়া রোদ! সকাল হলে তুমি দেখতে পাবে এখানকার চৌকিতে গদি নেই, আছে ছারপোকা।—কফির কাপের বদলে আছে মাটির ভাঁড়ে জোলো চা; ঈভনিং-ইন-পারী অথবা ক্যান্থারাইডিন নয়—পচা নর্দমার দুর্গন্ধে বাতাস এখানে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে।

"রাগ কোরো না নীলা। দোষ তোমার নয়। তুমি এ জীবনে অভ্যস্ত নও। তোমার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি গড়ে উঠেছে অন্য পরিবেশে। ঝোঁকের মাথায় তুমি সব ত্যাগ করে আসতে চাইছ; কিন্তু কাল সকালে তোমার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। কাল না হোক কালে এ কথা তোমার মনে হবেই। এই একটি মুহূর্তের ভুলের বোঝা বয়ে চলতে হত তোমাকে আজীবন। কারণ এ ঘরে একটা রাত্রি যাপন করা মানেই বাকী জীবনের রাত্রিগুলির মৃত্যুপরোয়ানায় সই দেওয়া।

"ভুল বুঝো না আমাকে। আমি আজও তোমাকে তেমনিই ভালোবাসি। বছর দশেক আগে বিদায় নেবার সময় বলেছিলাম, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।' আজও বিদায় দেবার সময় বলছি, ঐ একই কথা। এ কথা বলছি না যে, আমার সঙ্গে জীবন যুক্ত করা তোমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তবে তার জন্য প্রস্তুতি চাই, শুধু মানসিক নয় শারীরিকও। ঝোঁকের মাথায় সেটা যেন না হয়। আমি তোমাকে অনুরোধ করব—নিজের মন তুমি ভালো করে যাচাই করে দেখো। যদি তোমার বাবার মেকী দেশসেবায় সত্যই অতিষ্ঠ বোধ করে থাক, যদি ঐশ্বর্যের বেড়া ভেঙে নেমে আসতে চাও এই সংগ্রামময় জীবনের সমতলে, তাহলে কিছুদিন তোমাকে এ পথে চলবার শিক্ষানবিশি করতে হবে। আমি বলব স্বেচ্ছা-দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে হবে কিছুদিন তোমাকে। তোমার বাবার কাছ থেকে কোনও সাহায্য নিতে পারবে না।

তোমার পরিচিত সমাজ থেকে এভাবে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে যদি কয়েক মাস আমার জীবনের সুখ-দুঃখের আস্বাদ নিতে পার এবং তারপরেও অবিচলিত রাখতে পার তোমার আজকের সঙ্কল্পে তাহলেই সার্থক হবে আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বরণ করে তুলব সেদিন আমার জীবনলক্ষ্মীকে।

"আরও একটা কথা। তুমি উচ্চশিক্ষিতা। ফিলসফিতে এম. এ পাশ করেছ তুমি। আমি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম যখন ধরা পড়ি। তারপর কলেজে শিক্ষালাভ ঘটে নি আমার। সহরাজবন্দীদের কল্যাণে সমাজদর্শন, অর্থনীতি বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি মাত্র। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমার শিক্ষাগত একটা প্রভেদ আছে। এ কথাটাও তুমি বিচার করে দেখো।

"শেষ কথা। তোমার সঙ্গে আমার একটা প্রভেদ আছে। তুমি নাস্তিক,—তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ। দিনান্তে একবার তাঁকে স্মরণ না করলে মনে বল পাই না। আমি বিশ্বাস করি, তিনি আছেন আনন্দঘন কল্যাণময় রূপে। এখানেও আমাদের অমিলটা অত্যন্ত ব্যাপক। যুক্তিতর্ক দিয়ে তোমাকে স্বমতে আনতে পারব না—তুমিও পারবে না তোমার নাস্তিকতার গোলাবর্ষণে আমার এ বিশ্বাসদুর্গকে বিধ্বস্ত করতে।

"জানি না ক্ষমা করতে পারলে কিনা আমাকে।

"এ চিঠির প্রত্যুত্তর আমি আশা করছি না। আমি বিশ্বাস করব তুমি আত্মসমীক্ষান্তে ফিরে আসবে ঠিক যেখান থেকে আজ ফিরে যেতে হল সেখানে। যদি স্থির কর যে আসবে না—তবে সে কথাও আমাকে জানিও না। সে কথায় আমার প্রয়োজন নেই—কারণ অন্য কোনও জীবনসঙ্গিনী আমার কল্পনার বাইরে। না হয় অহেতুক আশাতেই কাটুক না আমার বাকী জীবন। ইতি

অরুণাভ।"

—স্যার।

—হ্যাঁ?

—আপনার আজও তো খাওয়া হয় নি সারাদিন।

নন্দর এ প্রশ্নের জবাবে এবার স্বীকার করেন পরমানন্দ—না, সারাদিনে কোনও আহার্য জোটে নি তাঁর।

—আপনার খাবার আনব?

—আন। হাঁরে, ছোট মহারাজ আসেন নি আর?

নন্দ জানায় যে, ইতিমধ্যে ছোটমহারাজ এসে দিয়ে গেছেন একখানি চিঠি।

নন্দ খাবার আনতে যায়।

দ্বিতীয় চিঠিখানি খুলে বসেন পরমানন্দ। গুরুদেব লিখছেন:

"পরমকল্যাণীয়েষু,

নীলা মার জন্য চিন্তা করিও না। সে আমার সহিত তীর্থভ্রমণে যাইতেছে। মানস পর্যন্ত যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমাকে জানাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না—কারণ তুমি জানিলে এরূপ কপর্দকহীন অবস্থায় আমাদের তীর্থযাত্রা সম্ভব হইত না। অপর পক্ষে তীর্থ-ভ্রমণের রাজসিক ব্যবস্থা হইলে আমাদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। আমার না হইলেও নীলার হইত।

আশীর্বাদক। ইতি—"

চিঠিখানি শেষ করে মিনিট দশেক স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন পরমানন্দ। মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তুষারাচ্ছাদিত এক সানুদেশ; সুদুর্গম যাত্রাপথে চলেছেন দুজন পথিক দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে—একজন জ্ঞানবৃদ্ধ সন্ন্যাসী, অপরজন অভিমানক্ষুব্ধ তাঁরই আত্মজা। চুম্বকখণ্ড তাহলে দিক পরিবর্তন করেছে! বিকর্ষণ রূপান্তরিত হয়েছে ঐকান্তিক আকর্ষণে! উপকরণের দুর্গপ্রাকার থেকে মুক্তি পেয়েছে নীলা। ঠিকই বলেছিলেন গুরুদেব—নীলা এগিয়ে গেছে সাধনমার্গে তাঁকে পিছনে ফেলে।

উঠে পড়েন উনি। মনস্থির করেছেন এতক্ষণে! লেটার প্যাডটা বার করে সর্বপ্রথমেই লিখে ফেলেন একখানা চিঠি। শেষ করে আবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। খামটা বন্ধ করে উঠে যান উপরের ঘরে। সুটকেশটা টেনে নিয়ে গুছিয়ে তুলতে থাকেন জামা কাপড়। প্যান্ট, শার্ট, টাই, গরম জামা, ড্রেসিং গাউন, শেভিং সেট, একে একে গুছিয়ে তোলেন। তারপর হঠাৎ কি ভাবেন কয়েকটা মুহূর্ত। আবার খালি করেন সুটকেশটা। নাঃ এ-সব নেবেন না তিনি। কিট ব্যাগটায় ভরে নেন খান কয়েক ধুতি। খান দুই কম্বলও নেন, একটা লেডিজ গরম ওভারকোট। বাস, আর কিছু নয়।

বেশী সময় লাগল না গুছিয়ে নিতে। টাইম টেবিলটা দেখেন একবার। হ্যাঁ, ট্রেন একটা আছে। এখনি বের হলে ধরতে পারবেন। এখনই যাবেন তিনি। জনকপুর স্টেশনে দেখা পাবেন ওঁদের নিশ্চিত।

খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে নন্দ উঠে এসেছে দোতলায়—ডাইনিংরুম খালি দেখে।

—ও-সব এখন থাক। তুই শীগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি দেখ!

—আপনি আগে খেয়ে নিন।—নন্দ এবার একটু দৃঢ়কণ্ঠে বলে। কিন্তু পরমানন্দ তার চেয়েও দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠেন—বিরক্ত করিস না নন্দ। যা বলছি কর। ট্রেনটা আমায় ধরতে দে।

নন্দ তার মনিবকে চেনে। আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে যায় ট্যাক্সি ডাকতে। বারান্দায় পায়চারি করতে থাকেন পরমানন্দ অস্থির পদবিক্ষেপে! না, হার তিনি স্বীকার করবেন না। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। সে ভুলকে স্বীকার করে নেওয়ায় লজ্জা নেই। ভুলকে সংশোধন করা, তাকে জয় করাই মনুষ্যত্ব। পরমানন্দও প্রমাণ দেবেন তিনি আদর্শচ্যুত নন—আদর্শের জন্য তিনি আজও সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

ট্যাক্সিতে উঠবার সময় পিছনে এসে দাঁড়াল কালো রঙের হিন্দুস্থানখানা। নেমে এলেন হর্ষোৎফুল্ল ননীমাধব, সুসংবাদটা দিতে—কংগ্র্যাচুলেশন্স। সব ঠিক হয়ে গেছে ভাই কিশলয় গাঙ্গুলী হ্যাজ উইথড্রন—তোমার পথে আর কোনও বাধা নেই—

বাধা দিয়ে পরমানন্দ বলেন—বেশি কথা বলার আমার সময় নেই ননীমাধব। আর আঠারো মিনিট মাত্র বাকী আছে ট্রেন ছাড়ার। আমি চললাম। এই চিঠিখানা তারিণীদাকে দিও।

ননীমাধবকে বস্তুত কোনও প্রত্যুত্তর করবার সুযোগ না দিয়েই রওনা হয়ে গেলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

মুহূর্তখানেক ননীমাধব দাঁড়িয়ে থাকেন স্থাণুর মতো। তারপর অসীম কৌতূহল নিয়ে খামটা খুলে পড়তে থাকেন চিঠিখানা।

আশ্চর্য কাণ্ড! পরমানন্দ তাঁর তারিণীদাকে জানাচ্ছেন, অনিবার্য কারণে তিনি নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। কারণটা কি তা লেখেন নি। তবে শেষদিকে লিখেছেন "অধ্যাপক গিরীন্দ্রবাবু আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি। দীর্ঘতর দিন তিনি যুক্ত ছিলেন আমাদের পার্টিতে। এখানে নমিনেশন না পাইয়া তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়াছেন। গিরীন্দ্রবাবুর বদলে আপনারা আমাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এজন্য নয় যে, আমি যোগ্যতর ব্যক্তি। কারণটা অর্থনৈতিক। এ ভোটযুদ্ধে পাড়ি দিতে আমি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিব- অধ্যাপক বসু মহাশয়ের পক্ষে তাহা করা সম্ভবপর নহে। অপ্রিয় হইলেও কথাটা সত্য। শেষ মুহূর্তে আমার এই আকস্মিক পশ্চাদপসরণে আপনারা বিব্রত বোধ করিতে পারেন—তাই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ পার্টি-ফাণ্ডে জমা দিবার জন্য একটি ক্রশ চেক এইসঙ্গে রাখিয়া গেলাম। আশা করি অতঃপর আপনারা আর গিরীন্দ্রবাবুকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করিবেন না। ক্ষমাপ্রার্থী ইতি॥"

বিস্মিত বিমূঢ় ননীমাধব স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চিঠিখানি হাতে করে। এ ছেলেমানুষির কোনও মানে হয়!

এখানেই আমার কাহিনী শেষ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এর পরবর্তী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিতান্তই বাহুল্য। সংসারাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান পাঠক অনায়াসেই সেটা অনুমান করতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি যিনি প্রথম পড়লেন তিনি

আমাকে বলে বসলেন যে, কাহিনীটি সুসমাপ্ত নয়। আদর্শনিষ্ঠ পরমানন্দ তাঁর আদর্শে ফিরে গেলেন—এটাই নাকি কাহিনীর শেষ কথা হতে পারে না। এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়—অরুণাভের আদর্শের কথা, নীলার বিবাহের কথা। আমার মতে সে-সব কথা দ্বিতীয় একটি কাহিনীর বিষয়ভুক্ত হতে পারে মাত্র; এবং তাহলেও সে কাহিনীটি পুনরুক্তিদোষে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবে শুধু। তবু প্রথম পাঠিকার অনুরোধে কয়েকটি স্থূল সংবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হলাম।

ডাক্তার পরমানন্দকে জনকপুর পর্যন্ত যেতে হয়নি, সাজাহানপুরেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন গুরুদেবের। সে যাত্রা বেশী কষ্ট পেতে হয় নি তাঁকে। নীলা লক্ষ্মী মেয়েটির মতোই ফিরে এসেছিল তাঁর সঙ্গে।

সেই একদিনের ছেলেমানুষির কথা মনে পড়লে আজ নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হন পরমানন্দ। সারাটা দিন যেন একটা ভূত চেপেছিল তাঁর ঘাড়ে। সেন্টিমেণ্টাল হওয়াটা পাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তিনি; সেই একদিনের ছেলেমানুষির খেসারত হিসাবে অ্যাসেম্লিতে যাওয়া পেছিয়ে গেছে বছর পাঁচেকের জন্য। শুধু কি তাই? অহেতুক কতকগুলো টাকাও অর্থদণ্ড হল! অবশ্য হতোদ্যম হন নি তিনি মোটেই। কর্মবীর তিনি—এত সহজেই ভেঙে পড়বেন কেন? ক্রমে ম্যানেজিং এজেন্সিটা হাতে এসেছে এতদিনে। প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করে চলেছেন তিনি শ্রমিকদের পিছনে। আগামী বারে মজদুর-মহল্লার সব কটা ভোট তাঁকে পেতেই হবে! এই শুভকর্মে তিনি নিয়োজিত করেছেন উপযুক্ত লোককেই।

অরুণাভ নন্দী এখন বার্টন এ্যাণ্ড হ্যারিস কোম্পানির লেবার-ওয়েলফেয়ার অফিসর। নীলাকে বধূরূপে গ্রহণ করার অর্থনৈতিক বাধাটা এখন আর নেই। মেহনতী মানুষের ভালো করার পূর্ণ দায়িত্ব অরুণাভের উপরই ন্যস্ত করেছেন ম্যানেজিং ডাইরেকটর। মজদুরদের জন্য ক্লাবঘরে এসেছে নতুন রেডিও, মজদুর-মণ্ডলীর আসর শুনতে ওরা গোল হয়ে বসে। মেহনতী মানুষদের প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ড খোলার আয়োজন

হচ্ছে, অসুস্থ মজুরও যেন মারা না পড়ে সে ব্যবস্থা হচ্ছে। আরও কত পরিকল্পনা রয়েছে. অরুণাভ বয়স্কদের জন্য নৈশ স্কুলও খুলতে চেয়েছিল, কিন্তু ওটাতে আপত্তি আছে কর্তৃপক্ষের। পরে অরুণাভও বুঝতে পেরেছে লেখাপড়া শিখিয়ে আর কি লাভ হবে ওদের—ওরা তো আর কেরানী হয়ে উঠবে না কোনদিন! শিক্ষা ওদের কাছে আশীর্বাদ নয় অভিশাপ! অরুণাভ আজও মনেপ্রাণে মজদুরদরদী! যদিও অফিসার হওয়ার পর মজুরদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মেলামেশাটা এখন সম্ভব নয়, তবু মে টা অঙ্কের মাহিনা থেকে মাঝে মাঝে সরু-মোটা অঙ্কের চাঁদা তাকে দিতে হয় পার্টি-ফাণ্ডে।

আগামী বিশ্বকর্মা পূজায় মজদুরদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটা নাটক সে মঞ্চস্থ করবে মনস্থ করেছে। অশ্রুতপূর্ব তার মৌলিক পরিকল্পনা! মজদুর, মসীজীবী এবং দু-একজন অফিসার পর্যন্ত নাকি একই মঞ্চে অভিনয় করবে এবার। সাম্যের এক চূড়ান্ত স্বাক্ষর সে রেখে যাবে রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে! ডাঃ পরমানন্দকে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার পরিকল্পনার কথা। খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন পরমানন্দ; বলেছিলেন, থিয়েটার আমিও এককালে খুব করতাম, কিন্তু এমন চিন্তা আমার মাথাতেও আসে নি।

অরুণাভ বলেছিলে: তাহলে প্রধান চরিত্রটা আপনিই করুন না।

—নাটকটা কি?

—তারাশঙ্করবাবুর 'দুই পুরুষ';—আপনি নুটুবিহারীটা করুন।

পরমানন্দ হেসে বলেছিলেন: ও চরিত্রটাও এককালে আমি করেছি, তবে কি জান—আমাদের যুগ গত হয়েছে। তোমরাই এখন ও-সব করো। আমরা পিছনে আছি।

অগত্যা অরুণাভকেই রাজী হতে হয়েছে নুটুবিহারীর চরিত্র অভিনয় করতে। নাটকটা পুরাতন; বহুবার এ নাটককের অভিনয় সকলে দেখেছে। তবু নবীন অভিনেতা চরিত্রটা কেমন অভিনয় করে সেটা দেখবার জন্য সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে!

মীলা অবশ্য টিকতে পারে নি। সে নাকি আজকাল পণ্ডিচেরিতে থাকে!

—